হাসিকান্নার জাদুকর

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

॥ এক ॥

দুপুর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে, চারিদিকে প্রায়াপরাহ্ণের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু গ্রামপ্রান্তের দিঘির ঘাট তখনও একেবারে জনশূন্য হয় নি। জনকয়েক বৃদ্ধা তখনও জলে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রম্ভালাপ চালিয়ে যাচ্ছেন—পরচর্চার অম্লকষায় রসায়নে সুস্নিগ্ধ অবসরমুহূর্তগুলিকে সরস করে তুলছেন। তাঁদের জীবনেও অপরাহ্ণ সমাগতপ্রায়, কোন কাজেই আর তেমন তাড়া নেই।

শান-বাঁধানো ঘাট নয়; ঢালু পাড়ের ওপর জলের ধারে কতকগুলো বড় বড় পাথর বসিয়ে একটা ঘাটের মত করে নেওয়া হয়েছে।

জল থেকে অনেকটা ওপরে বড় একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এমনি একখানা পাথরের ওপর চুপ করে বসে আছে বারো-তেরো বছর বয়সের একটি বালক। মুখখানি বড় বিষণ্ন; চোখের দৃষ্টিতে অসহায় হতাশার ব্যাকুলতা।

বালকটি এসেছে জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে। কতক্ষণে ঘাট জনশূন্য হবে তারই জন্যে বসে বসে অপেক্ষা করছে।

এই গ্রামেরই কোন টোলের ছাত্র। বিশেষ মেধাবী ছাত্র নয়—ব্যাকরণের কটমট সূত্রগুলো কিছুতেই আয়ত্ত করে উঠতে পারে না। সতীর্থদের তুলনায় বয়স খুবই কম, তার ওপর লাজুক মুখচোরা স্বভাব। শিক্ষক ও সহপাঠীদের ধারণা হয়ে গেছে, সে অতি নির্বোধ—লেখাপড়ায় সে কোনদিনই বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। এবং এই ধারণার ছোঁয়াচ লেগে তার নিজের মনও ক্রমে ক্রমে গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

শিক্ষক মহাশয় প্রতিদিন তীব্র তিরস্কার করেন, সতীর্থগণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অতিষ্ঠ করে তোলে।—আজ সকালেই পাণিনির একটা সরল

সূত্রের ব্যাখ্যা করতে পারে নি বলে তাকে অধ্যয়ন-কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।……

এখন সে কি করবে? ব্যাকরণ বস্তুটা যে কিছুতেই তার মাথায় ঢুকতে চায় না! অথচ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করে বাড়ি ফিরে গেলে দরিদ্র পিতা হয়তো মনের দুঃখেই মারা পড়বেন: সেকথা চিন্তাও করা যায় না।

এ সমস্যার সমাধান সে করে উঠতে পারে নি। তাই আত্মহত্যা করে সব দুশ্চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাবে মনস্থ করেছে।

—কিন্তু বুড়ীগুলো যে ছাই জল থেকে উঠতেই চায় না!

চুপ করে বসে আছে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে—এমন সময় নজরে পড়ল, জলের ধারে পড়ে আছে মস্ত বড় একখানা চ্যাপটা পাথর, আর তার ওপর প্রকাণ্ড একটা গোল গর্ত।

মন অকারণেই কৌতূহলী হয়ে উঠল।—তাইতো, অমন শক্ত পাথর, তার গায়ে অতবড় গর্ত হল কি করে?

একটু পরেই যে আত্মহত্যা করতে চলেছে, তার পক্ষে এ ধরনের কোন প্রশ্ন তোলা নেহাৎই অযৌক্তিক। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র বস্তু। চিন্তার ঘোড়া যখন একবগ্‌গা হয়ে কোন দিকে ছুটতে থাকে, যুক্তির রাশ টেনে তাকে কিছুতেই সংযত করা যায় না।

কৌতূহল ক্রমে যখন অদম্য হয়ে উঠল তখন বালক আর চুপ করে থাকতে পারল না। এক বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করে বসল, 'হ্যাঁ বুড়ী-মা, ঐ পাথরখানায় অতবড় একটা গর্ত হল কি করে?'

বুড়ী উত্তর দিল, 'মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, ঐ পাথরের ওপর কলসী রাখে—অনেক দিন ধরে অনেক কলসীর ঘষা লেগে অমন হয়েছে।'

'কিন্তু তা কি করে হবে? কলসী তো মাটির—আর পাথর কত শক্ত জিনিস—'

'তা হয় বাবা, হয়। ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয় হয়।'…

তার পর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বুড়ীরা সবাই চলে গেছে। সূর্যদেব পশ্চিমদিকে অনেকখানি ঢলে পড়েছেন। কিন্তু বালক আত্মহত্যা করে নি। সে তখনও বসে বসে ভাবছে।

ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয় হয়! তাহলে—তাহলে—সেও যদি একমনে ঘষতে থাকে, তার মূঢ়তার পাথরও তো একদিন না একদিন ক্ষয়ে যাবে! তবে তো তারও আশা আছে!

বালকের চোখে তখন এক নূতন দীপ্তি ফুটে উঠেছে। মন এক নূতন আশার মূলমন্ত্র জপতে শুরু করেছে—ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয় হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে সে দৃঢ় পদক্ষেপে টোলের দিকে ফিরে চলল।···

এ সব অনেক কাল আগেকার কথা।

এই বালক বড় হয়ে মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েছিল, বিখ্যাত ব্যাকরণের পুঁথি রচনা করেছিল।

বালকের নাম ছিল বোপদেব শর্মা।

নামসাম্যের কথা বলছি না—ওটা নেহাৎই একটা আকস্মিক সংঘটন। কিন্তু মানসিক প্রবণতার দিক দিয়েও প্রাচীনযুগের এই বোপদেব শর্মার সঙ্গে আমার একটু সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যের কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না।

বৈয়াকরণ বোপদেব শর্মার মত আমিও একজন ঘর্ষণ-বিশারদ—প্রায় সারা জীবন ধরে ঘষছি, এখনও ঘষার পালা শেষ হয় নি।

আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে, বাংলা ১৩২০ সালে এই ঘর্ষণ-পর্ব শুরু হয়—অর্থাৎ বাংলা-সাহিত্যপাঠে হাতেখড়ি হয়। সে সাহিত্যপাঠকে শুধু ঘষা কেন, ঘষটানো বলে বর্ণনা করলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শক্ত কথাগুলোর উচ্চারণ তখন বানান করে ঠিক করতে হত, বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করে মানে জেনে নিতে হত। এমনি করেই প্রথম বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী পড়ি, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়ি।

তার পর থেকে আর বিরাম নেই—ঘষেই চলেছি ক্রমাগত।

সেদিন একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'কি করে এত রাবিশ পড়েন আপনি? কি করে ধৈর্য বজায় রাখেন?'

মনে মনে হাসলাম। মনে পড়ে গেল সেই সব পুরানো দিনের কথা যখন যা পেয়েছি নির্বিচারে পড়েছি, গোগ্রাসে গিলেছি। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মাইকেল-শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে দামোদর মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সুরেন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ভট্টাচার্য পর্যন্ত কাউকে সেদিন বাদ দিই নি।—এখন তো তার তুলনায় অনেক কম পড়ি! আর রাবিশ?—সত্যি কথা বলতে কি, কিছু কিছু রাবিশ পড়তে আমার ভালই লাগে।

নির্বিচারে ঘষে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় মনের বিচারহীনতার পাথরখানা একটু ক্ষয়ে গেছে—ভোঁতা রসবোধের ফলায় একটু শান পড়েছে।

নিজে অনেক ঘষেছি; এবং সেই জন্যেই যে সব সাহিত্যিকের জীবনে সুদীর্ঘ ঘর্ষণের ইতিহাস আছে দেখতে পাই, তাঁদের প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব অনুভব না করে আমি থাকতে পারি না।

বস্তুত আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, সাহিত্যিকের জীবনে যদি দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষানবিসির, অসাফল্যের ও আশাভঙ্গ-জনিত মনস্তাপের অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে সত্যকার সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব।—দুরূহ সাধনায় সিদ্ধ সাহিত্যিকই একমাত্র সার্থক সাহিত্যিক।

—অর্থাৎ ঘষতে হবে।

অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। এমন অনেক সময় দেখা যায়, আগে কোনদিন কিছু না লিখে হঠাৎ কোন ভদ্রলোক একখানা বই লিখেই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেললেন—তাঁর বই হু-হু

করে বাজারে কাটতে লাগল; সাহিত্যের দরবারে তাঁর প্রতিষ্ঠার আসনও বেশ কায়েমী হয়ে গেল।

এ রকম ব্যাপার সাধারণত উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে—এবং এর কারণ খুঁজে বের করাও বিশেষ শক্ত নয়। কোন একজন সমালোচক বলে গেছেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনের মধ্যেই একখানা করে উপন্যাস লুকিয়ে আছে। আত্মজীবনীর আকর থেকে এই গোপন উপন্যাসখানা টেনে বের করতে কোন সৃষ্টিধর্মী কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয় না, এবং সামান্য কিছু অর্জিত শিল্পনৈপুণ্য থাকলেই এ উপন্যাসকে অনায়াসে দশজনের পাতে পরিবেশন করার উপযুক্ত করে তোলা যায়। এমন গ্রন্থের পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু সৃষ্টিধর্মী কল্পনা যাঁর নেই তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাহিত্যিক হবার আশা দুরাশা মাত্র। আত্মজীবনীর পুঁজি ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনাদৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে, অথচ সস্তা সাফল্যের নেশার ঘোর সহজে কাটতে চায় না—নিজের দৈন্য নিজে তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। ফলে যেমন হাউই-এর মত হু-হু করে একদিন আকাশে উঠেছিলেন তেমনি পোড়া কাঠির মত ঝুপ করে একদিন মাটিতে পড়ে যান। স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় হঠাৎ-অভ্যুদয় ও হঠাৎ-পতনের অনেক নজির আছে।

সৃষ্টিধর্মী কল্পনা হঠাৎ-পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, এ হল 'সাত রাজার ধন এক মাণিক'—অনেক সাধনার ধন। এর অঙ্কুরকে জীইয়ে রাখতে হলে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ মহীরুহে পরিণত করতে হলে, এর মুলে অনেক জলসেচন করতে হবে, অনেক সার দিতে হবে; শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে, অতন্দ্র হয়ে পাহারা দিতে হবে—যাতে খ্যাতির মোহের শূঁয়োপোকা এর শিকড় কেটে না দেয়, ব্যবসায়-বুদ্ধির ছাগল এসে পাতা মুড়িয়ে খেয়ে না যায়।

—অর্থাৎ ঘষতে হবে।

তাই যখন দেখতে পাই—বাংলা দেশের কোন তরুণ সাহিত্যিক হয়তো দুখানা বই লিখে একটু নাম করেছেন, পাঠক ও সমালোচক দুইএর কাছ থেকেই কিছু প্রশংসা পেতে শুরু করেছেন, অমনি তিনি প্রত্যাশা করতে লাগলেন, দেশের সমস্ত পুস্তক প্রকাশক আগাম রয়াল্‌টির দাদন দিয়ে তাঁকে বাড়ি করতে সাহায্য করবে, সিনেমার ডিরেক্‌টাররা মোটা টাকার চেক্ নিয়ে তাঁর দরজায় ধর্না দিতে থাকবে, সব কটা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ওপর তাঁর দাবিই সর্বাগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত হবে, এবং সাহিত্য-সম্রাটের সিংহাসন শূন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তার ওপর বসিয়ে দেবে—তখন মনটা সত্যই বড় বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, নৈরাশ্যে ভরে যায়।

এঁরা কেউ ঘষতে রাজী নন। এঁরা সস্তায় বাজিমাত করতে চান, গাছে না উঠেই এক কাঁদির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। এঁদের কপাল পাথর-চাপা, এবং সে পাথর ক্ষয় হবার কোন সম্ভাবনাই দেখছি না।

অথচ প্রবীণ সাহিত্যিকদের দিকে যদি এঁরা একবার চেয়ে দেখেন তাহলে এমন অনেককে দেখতে পাবেন যাঁরা যৌবনে পাইস্ হোটেলে খেয়ে আর পরের বৈঠকখানায় রাত্রিবাস করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, পঁয়ত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে সাহিত্য-সাধনার পর তবে বই বেচে দুটো পয়সা পেয়েছেন, পত্র-পত্রিকায় আড়াইশো রচনা প্রকাশিত হবার পর তবে প্রথম বই ছাপতে সাহস করেছেন।

অনেক ঘষতে হয়েছে—সাফল্য, সম্মান, বাড়ি, গাড়ি, যা কিছু আজ অপরের অন্তর্দাহের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্যে দাম দিতে হয়েছে প্রচুর।

তরুণ সাহিত্যিকদেরও এ দাম দিতে হবে—বোপদেবীয় ঘর্ষণশিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥

—সচ্চিদানন্দস্বরূপ মুকুন্দকে প্রণিপাত জানিয়ে বোপদেব শর্মা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়নে হাত দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পরোপকারসাধন।

এ যুগের বোপদেব শর্মা পরোপকারের স্পর্ধা রাখে না।—তাছাড়া পরোপকার নামধেয় প্রক্রিয়াটি আজকাল সামাজিক কর্মসূচী থেকে বাতিল হয়ে সরকারী কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছে। যত কিছু পরোপকার সব আজকাল সরকারের একচেটে হয়ে গেছে। সাধারণ লোকের পরোপকারে প্রবৃত্তি নেই, পরোপকারের সামর্থ্য নেই, অধিকারও নেই। মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে পরোপকার করাও বোধ হয় শীঘ্রই বে-আইনী হয়ে যাবে।

না—আমার লেখনী-চালনার উদ্দেশ্য পরোপকারসাধন নয়, আপন জনের উপকার সাধন।

বাংলা দেশের কোন তরুণ সাহিত্যিক এবং বাংলা সাহিত্যের কোন পাঠক-পাঠিকাকে আমার পক্ষে পর বলে ভাবা অসম্ভব। তাঁরা সবাই আমার আপনার জন, সবাই আমার আত্মার আত্মীয়।—এবং আমার লেখা শুধু তাঁদেরই জন্যে।

প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকদের আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, মনে মনে একটু ভয়ও করি।

সাহিত্যপাঠকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহানুভূতির সম্পর্ক, একাত্মবুদ্ধির সম্পর্ক—কারণ আমিও একজন সাহিত্যপাঠক ব্যতীত অন্য কিছুই নই।

তরুণ সাহিত্যিকদের আমি ভালোবাসি। এবং ভালোবাসি বলেই অনেক সময় তাঁদের গালমন্দ দিই, তাঁদের নিয়ে রঙ্গরস করি, এমন কি মাঝে মাঝে তাঁদের পিঠ চাপড়ে দিতেও সাহস করি।

বৈয়াকরণ বোপদেব শর্মার স্বর্গত আত্মার আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভ করে তাঁরা ধন্য হন।

তাঁরা ঘষতে শিখুন।

॥ দুই ॥

সাহিত্য-পাঠকদের মত অসহায় জীব ভূ-ভারতে আর নেই। তাদের ইউনিয়ন নেই, সমিতি নেই, সমবায় নেই, এমন কি একটা বাৎসরিক সম্মেলনও নেই। গাঁটের কড়ি খরচ করে তারা বই কেনে, পত্র-পত্রিকা কেনে—পরিবর্তে চায় শুধু একটু আনন্দ। দাদ চুলকানোর আনন্দ কিংবা পরচর্চার আনন্দ কিংবা সিনেমা দেখার আনন্দ নয়, তার চেয়ে একটু উচ্চতর, একটু বিশুদ্ধতর আনন্দ, অর্থাৎ রসোপভোগের আনন্দ তারা প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশার টোপগাঁথা বঁড়শি দিয়েই সাহিত্যের কালোবাজারীরা তাদের শিকার করে। কাঞ্চনের বদলে তারা পায় কাচ, হীরের বদলে পায় জিরে। বঁড়শি গিলবার পর সাহিত্যিক ছিপের হ্যাঁচ্কা টানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা গিয়ে পড়ে নগ্ন নোংরামির পঙ্ককুণ্ডে অথবা হিংস্র আইডিওলজির কাঁটাবনে অথবা উন্নাসিক higher culture-এর মরুভূমিতে। তখন তাদের দম বন্ধ হয়ে ধড়ফড় করে মরা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

বোপদেব শর্মা এদেরই এক জন—সাহিত্যিক নয়, সাহিত্য-পাঠক। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্য সে পড়ে আসছে, বাংলা সাহিত্যকে ভালোবেসে আসছে। বহু ঠকেছে, বহু ভুগেছে, বহু দাগা পেয়েছে, কিন্তু তবু হাল ছাড়ে নি—প্রত্যাশা তার এখনও ফুরোয় নি। প্রত্যাশা-পরিপূরণের আনন্দও সে পেয়েছে বই কি! শৈশবেই আবিষ্কার করেছে বঙ্কিমচন্দ্রকে, রবীন্দ্রনাথকে; কৈশোরে মধুসূদনকে, শরৎচন্দ্রকে; যৌবনে বিভূতিভূষণকে ও আরও কয়েক জনকে (নাম করতে পারব না, মার্জনা করবেন)। সেই সব অতীতের মুহূর্তগুলির রোমাঞ্চক আনন্দ ও উন্মাদনার কথা মনে হলে এখনও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণের তার অন্ত নেই।

এই ঋণ-পরিশোধের প্রচেষ্টায় কি না তাকে করতে হয়েছে! অকবির লেখা কাব্য, অরসিকের লেখা রস-সাহিত্য গাদা গাদা পড়তে হয়েছে। লিভার পেকে গেলেও যেমন মাতাল মদ ছাড়তে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে গ্লানি ও বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠলেও সাহিত্যপাঠের নেশা সে ছাড়তে পারে নি। গড়ে প্রতি পাঁচ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের বাজারে একটি করে "যুগান্তকারী প্রতিভা"-র আবির্ভাব হয়—এখনও হয়, আগেও হত। এঁদের শিল্পপ্রতিভার "চূড়ান্ত নিদর্শন"-গুলির সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করতে হয়েছে। [বিগত যুগের এই সব জনপ্রিয় সাহিত্যরথীদের নাম ও বর্তমান খ্যাতির কথা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল, কারণ বর্তমান যুগেও জনপ্রিয় সাহিত্যিকের অভাব নেই।]

বয়স ও বুদ্ধি পরিপক্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে বোপদেব শর্মার সাহিত্য-পাঠের ধরন একটু বদলেছে—সে পড়তে পড়তে ভাবতে শিখেছে। বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা কতটুকু সে লাভ করেছে, কিংবা আদৌ করেছে কিনা, সে সম্বন্ধে তার নিজেরও হয়তো সন্দেহ আছে—কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ একটা ক্ষমতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ! মোটামুটি ভাল-মন্দের পার্থক্য সে ঠিক বুঝতে পারে, মেকি মাল দিয়ে তাকে ঠকানো যায় না। —"The judgement of literature is the long-delayed reward of much endeavour." এই "much endeavour"-এর দাবিতেই সে মাসের পর মাস সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের একাংশ সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করে আসছে। উদ্দেশ্য — সাহিত্য-দিগ্দর্শন ব্যাপারে সাহিত্য-পাঠকদের একটু সাহায্য করা, ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে পথ হারিয়ে যাতে তারা অপসাহিত্যের মহাপঙ্কে নিমজ্জিত না হয় তারই যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

এই সাহিত্য-পরিক্রমা-প্রচেষ্টার ফলে তার শত্রুসংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, বহু বন্ধুও বিগড়ে গেছে। সাহিত্যিকেরা কেউই তার ওপর খুশী নন। কোন সাহিত্যিকের পর পর দশটি

রচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করার পরও যদি তৎপরবর্তী কোন রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, তখুনি তিনি মহাক্রোধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, চারিদিকে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন, বোপদেব শর্মা লোকটা কাণ্ডজ্ঞানহীন মহামূর্খ, সে মদ খায়, তার চরিত্রদোষ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরাও তাকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না—প্রধানত দুটি কারণে। প্রত্যেক সম্পাদকেরই দুই-একটি করে পোষা সাহিত্যিক থাকে, এবং একমাত্র এই সম্পাদকীয় patronage ছাড়া (যার সত্যকার হেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহিতং গুহায়াং) আর কোন সাহিত্যিক গুণের সন্ধান এঁদের মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। বোপদেব শর্মাকে বাধ্য হয়ে অনেক সময় এই সব সাহিত্যিক পরগাছাদের নিন্দা করতে হয়। তা ছাড়া প্রায় সব সম্পাদকই মনে করেন, যেহেতু তাঁরা অমুক অমুক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক, সেই হেতু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাহিত্যিক মর্যাদাও তাঁদের অবশ্য-প্রাপ্য। তাঁদের এই বিচিত্র দাবি বোপদেব শর্মা মানতে রাজী নয়। সাহিত্য-সমালোচকেরা তো তাকে প্রায় অপাংক্তেয় জীব বলেই মনে করেন, কারণ সে চট্ করে মনের কথা বলে ফেলে, ভাষার ভেল্‌কিবাজি দিয়ে জল ঘুলিয়ে নিজের বক্তব্যকে অপরিস্ফুট করে রাখা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া সে অপণ্ডিত ব্যক্তি—গণ্ডা গণ্ডা বিদেশী নামের ফর্দ তার লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না ; শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে রিল্‌কে-কে তার শ্রেষ্ঠতর কবি বলে মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথের রচনার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের রচনাকে অনেক বেশী রসঘন বা গাঢ়বদ্ধ বলে মানতে সে রাজী নয়।

সাহিত্যের বড়বাজারের যাঁরা কারবারী মানুষ তাঁরা সকলেই বোপদেব শর্মার লেখা পড়ে বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন, ক্রুদ্ধ হন। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। তাঁরা এ লেখা পড়েন কেন? এ লেখা তো তাঁদের জন্যে নয়। এ লেখা সাহিত্যপাঠকদের জন্যে, আর আমি যত দূর জানি, বাংলা দেশের

সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক বা সম্পাদক কেউই ঠিক সাহিত্য-পাঠক নন। রস বা আনন্দের মত তুচ্ছ বস্তুর সন্ধানী তাঁরা নন; তাঁরা চান অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। *সুতরাং বোপদেব শর্মার* মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পরিক্রমা-প্রচেষ্টার ফলে তাঁদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবার সম্ভাবনা নেই।

[এইমাত্র জনৈক "বন্ধু" সংবাদ দিয়ে গেলেন যে বাংলাদেশের বহু পাব্‌লিশারও নাকি বোপদেব শর্মার উপর মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু সে কারণ অনুসন্ধান করবার প্রবৃত্তি আর নেই।]

॥ তিন ॥

কিছুদিন থেকেই অনুভব করছি বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা নির্বেদের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গ-সাহিত্যিক আলোচনায় আগে যে আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করতাম এখন আর তা করি না। কেবলই মনে হয়, মরুভূমিতে চাষ দিয়ে বেড়াচ্ছি—এর ফলে ফণিমনসার জঙ্গল ছাড়া আর কোন ফসলই ফলবে না; ষাঁড়ের গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি—পরিণামে দুখানা ঘুঁটেও তা থেকে তৈরি হবে না।

হাবাগোবা পাঠক, আত্মপ্রবঞ্চক লেখক ও মতলববাজ সমালোচক—এই তিনেরই রাজত্ব চলছে আজ দেশ জুড়ে। যে-যার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিছু কিছু লাভও কুড়িয়ে নিচ্ছেন সাহিত্যের বাজার থেকে। সাহিত্য-সরস্বতী নিজেই শুধু দেউলে হতে বসেছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের চিরকেলে অবস্থা। এ সাহিত্যে যুগ-পরিবর্তন শুধু একটা কালগত ব্যাপার—সাহিত্যিক বিবর্তনের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও ইতিহাস-রচয়িতারা মাপ করবেন—এ সাহিত্যে যুগন্ধর কয়েকজনের উদ্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে যুগ-বৈশিষ্ট্য কিছু অর্জিত হয় নি। মাইকেল, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ কেউই তাঁর পরবর্তী যুগকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে রেখে যেতে পারেন নি।

সম্পূর্ণ বঙ্কিম-রচনাবলীর রসাস্বাদ করার পর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে পরিচিত হবার পর বাংলাদেশের পাঠক সাহিত্যানন্দ উপভোগ করেছে দামোদর মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী থেকে। বর্তমান যুগের অবস্থাও তা থেকে বিশেষ উন্নততর নয়, তবে নামধাম উল্লেখ করে আর শত্রুবৃদ্ধি করতে চাই না।

তাই বলছিলাম, বাংলা সাহিত্যের শিখরগুলো যত উঁচুই হোক না কেন, তার উপত্যকাগুলো বড় নীচু, বড় নোংরা, অন্ধকার আর স্যাঁৎসেতে—আর বর্তমানে আমরা তারই একটার তলায় পড়ে পচা পাঁক আর আবর্জনার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। সবচেয়ে কাছের শিখরটাও আজ আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে।

আমরা বুঝি বিজ্ঞাপন, আমরা বুঝি সমকালীন জনপ্রিয়তা, আমরা বুঝি নগদ-নারায়ণের দাক্ষিণ্য। সাহিত্যিক বা শৈল্পিক উৎকর্ষ আমাদের কাছে একটা কথার কথা মাত্র—উদ্দেশ্যসিদ্ধির দশ রকম উপায়ের মধ্যে একটা ; তার ওপর আমরা বড় একটা ভরসা রাখি না।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক বাজিয়ে এরগুকে মহাদ্রুম করা যায় না ; সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার গ্যাস ভরে উইঢিবিকে ফাঁপিয়ে হিমালয়ে পরিণত করা যায় না ; বই বেচে হাজার হাজার টাকা রোজগার করলেও তেলাপোকা তেলাপোকাই থাকে, পাখি হয়ে যায় না।

এই বয়সে অনেক দেখলাম। কত 'যুগান্তকারী' গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখলাম—তার অধিকাংশই আবার 'এপিক্': এপিক্ কাব্য, এপিক্ উপন্যাস, এপিক্ নাটক। যুগ যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, গ্রন্থ আর গ্রন্থকার দুইএরই অন্ত হয়ে গেল। কত 'উদীয়মান' সাহিত্য-সম্রাট উদিত হতে না হতেই অস্তমিত হলেন। সাহিত্যজগতের কত 'coming' প্রতিভা সারাজীবন ধরে শুধু আসতেই থাকলেন ; চুল পেকে গেল, দাঁত পড়ে গেল, নাতির নাতি হল, তবু—

They come, they come, they ever come (but never arrive).

অক্ষমতা পাপ নয়। কিন্তু অক্ষম ব্যক্তি বড় সহজেই প্রলুব্ধ হয় পাপের পথে পা বাড়াতে। বামন উদ্বাহু হতে পারে দুই কারণে: নিজেকে দীর্ঘতর প্রমাণ করবার জন্যে—তখন সে করুণার পাত্র। আর দীর্ঘকায়কে টেনে খাটো করবার জন্যে—তখন সে পাপাচারী। এই ঘৃণ্য পাপাচারের শনি আজ আমাদের সাহিত্য-দেহে প্রবেশ

করেছে অক্ষমতার রন্ধ্রপথ দিয়ে। তাই আজ আমাদের দেশের সত্যকারের ছোটর দল উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন সত্যকারের বড়দের ছোট প্রমাণ করবার জন্যে—বাপের মুখ পুড়িয়ে না দিতে পারলে তাঁদের পোড়ামুখের নাকি আদর হচ্ছে না।

অক্ষমতাজনিত দ্বিতীয় পাপটি হল পরানুকরণ। এ পাপ যেমন গভীরে শিকড় গেড়ে বসে তেমনি ছড়িয়েও পড়ে অনেকখানি জুড়ে। সাহিত্যের নীচুতলা থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সর্বত্র এর প্রসার। নীচের তলায় দেখতে পাই, একজন লিখে একটু নাম করলে কিংবা দু পয়সা কামালে আর পাঁচজন উঠে পড়ে লেগে যান 'ঐ রকম' জিনিস ঝাড়তে—সম্পাদকেরা ও প্রকাশকেরাও তাঁদের তাই করতেই উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আর ওপর তলায় উঠলে দেখতে পাবেন শুধু বিদেশী নামের ছড়াছড়ি—বোদলেয়ার, ম্যালার্মে, রিল্‌কে, র‍্যাঁবো, ডিল্যান টমাস, কামিংস, পাউণ্ড: 'ওঁদের মত' লিখতে হবে, নইলে সাহিত্যিক-জন্মই বৃথা। হয় এঁদের মত, নয় ওঁদের মত—নিজের মত করে লিখবার তাগিদ কারও মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। নিজের মূর্তি কারও দেখবার যো নেই—সবাই ছদ্মবেশী: কেউ বা সেজেছেন দেশী সঙ, কেউ বা বিদেশী ক্লাউন—তফাত এইটুকু।

সাম্প্রতিক সাহিত্য-দৃশ্যের দিকে চেয়ে তাই মনে নৈরাশ্য ঘনিয়ে আসে—এবং তারই ফলে আসে বৈরাগ্য। শ্মশান-বৈরাগ্যও একে বলতে পারেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা লিখেছি সবই একটা কৈফিয়ত মাত্র।

এ বছরের শারদীয়া সংখ্যার পত্র-পত্রিকা আমি একখানাও পড়ি নি—অর্থাৎ পড়তে পারি নি। চেষ্টা করেছি, কিন্তু যতবার করেছি ততবারই অপরিসীম ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে মন ভরে উঠেছে—পড়া এগোয় নি। গতানুগতিকতার অবিচ্ছিন্ন শোভাযাত্রা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অথচ এই তো কয়েক বৎসর আগেই আমি এগুলো পড়তাম, পড়ে আনন্দ পেতাম। তবে কি তখনকার শারদীয়া সংখ্যাগুলো সবই এখনকার চেয়ে ভাল হত। তা নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু তখন আমি ছিলাম বেপরোয়া আশাবাদী। বীজ অথবা অঙ্কুরের মধ্যে তখন ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনা দেখতে পেতাম; কয়লার টুকরো দেখে ভাবতাম, বয়স ও অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড চাপের ফলে এই কয়লাই একদিন হীরে হয়ে উঠবে। সেদিনের আনন্দ ছিল এই আশার আনন্দ।

আজ দেখছি, সাহিত্যের আঁতুড়ঘরে কচি কচি সম্ভাবনাগুলো সব পুঁয়ে-পাওয়া শিশুর মত কুঁকড়ে মরে যাচ্ছে। অক্ষমের স্পর্ধিত আস্ফালনে আর অন্তঃসারশূন্য পণ্ডিতম্মন্যদের লজ্জাহীন ভাঁড়-নৃত্যে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চ মুখর হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে দুই-একজন প্রবীণ পূজারীর হাতে-জ্বালা ক্ষীণ প্রদীপশিখা এখনও কাব্যলক্ষ্মীর বেদীমূলে জ্বলছে—কিন্তু সেই বা আর কদিন? বাকি সর্বত্র শুধু সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, বস্তাপচা পুনরাবৃত্তির অন্তহীন আবর্তন।

আশা বজায় রাখি কি করে বলুন তো?

অর্থাৎ—

'অর্থাৎ'—ডাক্তার বন্ধু অনেক ভেবে চিন্তে রায় দিলেন—'তোমার বয়স বাড়ছে, তুমি বুড়ো হয়ে পড়ছ। তা ছাড়া অত বড় একটা অসুখের পর তুমি এখনও পুরো সুস্থ হয়েও উঠতে পার নি। তোমার মেটাবলিজ্‌মের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে পড়েছে।'

॥ চার ॥

এ বৎসরের শারদীয়া পত্রিকাগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকখানি পড়বার বা পাতা উলটে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং তা থেকে মোদ্দা কথাটা যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই : বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখনও বুড়ো হাড়ের ভেল্‌কিই চলছে, মরা হাতিই লাখ টাকায় বিকোচ্ছে। ভাল বা মোটামুটি ভাল লেখার জন্যে আমাদের এখনও সেই তারাশঙ্কর, বিভূতি মুখুজ্যে, প্রমথ বিশী, বনফুল, বিমল মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা, শরদিন্দু, গজেন্দ্র মিত্র,, হরিনারায়ণ, নরেন্দ্র মিত্র, আশু মুখুজ্যে প্রভৃতিরই দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এই সব বৃদ্ধ বা অর্ধ-বৃদ্ধের দলই এখনও আমাদের রসাস্বাদন-স্পৃহা যথাসাধ্য চরিতার্থ করে যাচ্ছেন। কিন্তু যে সব উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকের প্রথম রচনাগুলি পড়েই আমরা চমকিত হয়েছিলাম, হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, তাঁরা কোথায়? শারদীয় সাহিত্যের হরিহরছত্রের মেলায় এত গল্প-উপন্যাসের ছড়াছড়ি—কিন্তু কৈ? তাঁদের মধ্যে কেউ তো কোথাও এমন কিছু লিখেছেন বলে মনে পড়ে না যা পাঠকের মনের ওপর গভীর কোন ছাপ রেখে যেতে পারে! সাহিত্যের সংসদে এখনও তাঁরা back-benchers হয়েই আছেন বলে মনে হয়।

কিন্তু কেন? সত্যই কি আমাদের তরুণ সাহিত্যিকেরা সবাই শক্তিহীন বা অক্ষম? এ কথা আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই। বহুবার এঁদের সৃজনী শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে অসাধারণ শক্তিধর সে সম্বন্ধেও আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তবে কেন এমন হচ্ছে?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় এঁদের অনেকেরই পুঁজি অতি সামান্য—দুই-একখানা বই লেখার পরই এঁরা সব পুঁজি খুইয়ে একেবারে দেউলে হয়ে পড়েন। এবং সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে

নূতন পুঁজি আহরণের technique-টি এঁদের জানা নেই। এঁদের বিশ্বাস বোধ হয় এই যে যা অস্বাভাবিক, যা অপ্রত্যাশিত, যা অসাধারণ তাই-ই শুধু সাহিত্যের বস্তু হবার যোগ্য। তাই জীবনের রাজপথ ও জনপথকে অগ্রাহ্য করে এঁরা শুধু জীবনের অন্ধকার কানাগলিগুলোর মধ্যেই ঘুরে বেড়ান পুঁজির সন্ধানে। কলকাতা শহরের সামান্য ভিক্ষুকটাও জানে কানাগলির মধ্যে তার রুজি-রোজগারের সম্ভাবনা খুবই কম, সেজন্যে তাকে প্রশস্ত রাজপথের পাশে এসেই দাঁড়াতে হবে। যেখানে ভিখারীর রুজি জোটে না সেখানে সাহিত্যের পুঁজি জুটবে কি করে? অবশ্য কানাগলিতেও মণিমুক্তা কুড়িয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সৌভাগ্য অতি সামান্য দুই-এক জনের অদৃষ্টে ঘটে—তাও অতি দৈবাৎ। কিন্তু কানাগলিকেই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে আবর্জনা কুড়িয়ে ঝুলি ভরা ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না। আবর্জনা বেচবার কোন বাজার নেই—এমন কি সাহিত্যের বাজারেও ও বস্তু অচল।

তাই সাহিত্যের সত্যকার পুঁজি যিনি সন্ধান করতে চাইবেন তাঁকে জীবনের গলিঘুঁজি ছেড়ে জীবনের সদর রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াতে হবে। মহৎ সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য হল জীবন—জীবনের বিকার নয়, সাধারণ স্বাভাবিক নিত্য-চলমান জীবন-প্রবাহ। কানাগলির মধ্যে হীরের টুকরো কুড়িয়ে পাওয়ার নাম আকস্মিক সংঘটন। জীবনের সাধারণত্বের ভিতর থেকে অসাধারণ মুক্তামণি আহরণের নাম আবিষ্কার। সত্যকার সাহিত্যিককে আবিষ্কারক হতে হবে। জীবনকে ভালোবাসতে হবে। তা হলেই জীবনের মণিকোঠার চাবি আপনিই হাতে এসে যাবে। আর পুঁজির অভাব হবে না। এ যাঁরা পারবেন না তাঁদের কারবারে লালবাতি জ্বলা অবশ্যম্ভাবী।

॥ পাঁচ ॥

সাহিত্যে অসাধারণত্বের অবতারণা দোষের জিনিস নয়। বস্তুত বহু সাধারণ পাঠক কিছু পরিমাণে অসাধারণত্বের প্রত্যাশা নিয়েই সাহিত্য পাঠ করতে বসে। অতি-রিয়ালিস্ট্ সাহিত্য-সমালোচকেরা যাই বলুন না কেন, সাহিত্যের মাধ্যমে যে বস্তু হোমর-বাল্মীকি-শেক্‌স্পীয়র-গ্যেটে-কালিদাস-কোল্‌রিজ-হুগো-টল্‌স্টয়ের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, আধুনিক মানসিকতার দোহাই পেড়ে তাকে নস্যাৎ করে দেবার মত দুর্বুদ্ধি আমাদের কদাচ হবে না—হতে পারে না।

অসাধারণ ঘটনা, অসাধারণ চরিত্র, অসাধারণ পরিবেশ চিরকাল মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। সে প্রেরণার প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায় নি, কোনদিন ফুরোবে না।

এ সব কথা অকপটে স্বীকার করার পরেও কিন্তু আরও কিছু বলবার থাকে।

আধুনিক সাহিত্যিকের, বিশেষ করে কথাসাহিত্যিকের সামনে আর একটা প্রয়োজনের তাগিদ খুব জরুরী হয়ে উঠেছে। সে তাগিদ না মেটাতে পারলে যুগের মনকে পরিতৃপ্ত করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

এই প্রয়োজনটা হল সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের আবিষ্কার।

অসাধারণ বস্তুর মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করে নিয়েও আধুনিক মানুষ সাধারণকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করতে আর রাজী নয়। বিগত রোম্যান্টিক যুগের সাহিত্যিকদের কাছে সে শিক্ষা পেয়েছে, জীবনের ব্যাপ্তির চেয়ে জীবনের গভীরতার তাৎপর্য অনেক বেশি; ক্ষুদ্র বালুকণার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের আনন্দময় অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে। এর ফলে সাহিত্যের কাছে তার প্রত্যাশার দিগন্ত অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অসাধারণ
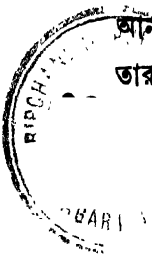
পরিবেশ, অপ্রত্যাশিত ঘটনাবিন্যাস ও অতিমানবীয় চরিত্র সৃষ্টির রঙচঙা খেলনা দিয়ে তাকে আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সাধারণ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, সে সাধারণ হলেও তুচ্ছ নয়। তার সত্তার গভীর গহনে অপরিমেয় ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তার হাসিকান্নার উৎস-সন্ধানী সাহিত্য-শিল্পীকে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। এবং এই দিব্যদৃষ্টি যাঁর নেই তাঁকে সে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাহিত্যিক বলে মেনে নিতে রাজী নয়।

সাধারণ মানুষের এই নবজাগ্রত মর্যাদাবোধের মূলে আছে একটা 'অহং-চেতনার বিস্ফোরণ'। নিজের মনের মানদণ্ড দিয়ে মেপে আত্ম-সচেতন মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, সাধারণকে যে শিল্পী বা সাহিত্যিক নিয়মিত ভাবে অবহেলা করেন তাঁর বুদ্ধি স্থূল, দৃষ্টি অগভীর, অনুভূতি ভোঁতা।

আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকদের কথাটা বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। অভিনব পরিবেশ ও নূতন ধরনের কথাবস্তুর সন্ধানে যখন তরুণ বাঙালী ঔপন্যাসিকদের ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে দেখি তখন মনে সন্দেহ জাগে, এঁরা কি যুগ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন? এঁদের কি সেই দিব্যদৃষ্টি আছে যা না হলে আধুনিক মানুষের শিল্পতৃষ্ণা সম্পূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত করা অসম্ভব?

দুখানি বহু-বার-পড়া উপন্যাস আবার সেদিন একবার নূতন করে পড়লাম—ডিকেন্‌সের 'ডেভিড্ কপারফিল্‌ড্' ও বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী।' 'পথের পাঁচালী'র বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোথাও অসাধারণত্বের ছিটেফোঁটাও নেই—এমন কি যে প্রকৃতি বইএর এতখানি জুড়ে রয়েছে তাও আমাদের সহস্রবার দেখা সাধারণ গ্রাম্য প্রকৃতি মাত্র। 'ডেভিড্ কপারফিল্‌ড্' সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। সাধারণ জীবন, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ ঘটনার চেয়ে বেশি কোথাও কিছু নেই। এমন কি মিঃ মিকবারও অতি সাধারণ লোক—কোন প্রতিবেশীই কোনদিন তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবার হেতু খুঁজে

পেয়েছে বলে মনে হয় না। আপনিও যদি তার প্রতিবেশী হতেন, আপনিও তাকে অসাধারণ বলে মনে করতেন না।

কিন্তু ডিকেন্‌স্‌ ও বিভূতিভূষণ দুজনেই ছিলেন সেই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। তাই এই সাধারণ জীবনের সমুদ্র মন্থন করে তা থেকে তাঁরা অসাধারণত্বের অমৃত আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাংলা দেশের তরুণ ঔপন্যাসিকদের কাছে তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই—তাঁরা অসাধারণত্বের উপাসনা ছেড়ে সাধারণত্বের সাধনায় ব্রতী হন। যা সাধারণ, যা স্বাভাবিক তার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী শৈল্পিক সম্ভাবনা নিহিত আছে। শুধু দেখবার চোখ থাকা চাই। আশা করি তাঁদের তা আছে।

॥ ছয় ॥

আচ্ছা, আপনারা কেউ বলতে পারেন, কি করলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হতে পারা যায়? এ যুগের সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের পক্ষে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হতে না পারার মত অপরাধ আর কিছুই নেই।

এই আমার কথাই ধরুন না কেন।

কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশের কবিরা নানাজাতীয় কবিতা লিখে আসছেন। সবই কিছু কিছু চেখে দেখেছি (অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে)—সবই ভাল লেগেছে এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে, কিন্তু সবই বুঝতে পেরেছি, রসগ্রহণেও কোন বড় রকমের বাধা অনুভব করি নি কোথাও। কিন্তু হঠাৎ মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশে-বিদেশে এক নূতন ধরনের কাব্যের উদ্ভব হয়েছে যা আমাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ও অসহায় করে ফেলেছে। এ বস্তুকে যদি মহৎ কাব্য অথবা সৎকাব্য অথবা কোন রকমের কাব্য বলে মানতে হয় তাহলে তো গত কয়েক হাজার বছরের সমস্ত কাব্যকেই অকাব্য বলে বাতিল করে দিতে হয়। এ কাব্যের অর্থ বা তাৎপর্য কিছুই আমি বুঝতে পারি না, কাজেই রসোপভোগের প্রসঙ্গ তোলা নিতান্তই অবান্তর।

আর শুধু কি কাব্য! 'নতুন রীতি'র ছোটগল্প পড়তে গেলে আমার মনে হয় যেন আমাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সর্বাঙ্গে জলবিছুটি লাগাচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকায় এমন উপন্যাসও বহু লেখা হচ্ছে, যেগুলি সম্বন্ধে আমাকে কোন রকম অভিমত দিতে হলে বলতে বাধ্য হব, এ সাহিত্য পাগ্‌লা গারদের জীবন অবলম্বনে পাগলদের জন্যে পাগলের দ্বারা রচিত।

আর একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি—আমি একা নই, আমার দলে লোক অনেক আছেন; তাঁদের মধ্যে রথীমহারথীরও অভাব

নেই। তবে তাঁদের অনেকেরই হাতে কোন কাগজ নেই, কাজেই মনের কথা সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করে বলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে সব রথীমহারথীর কথা বললাম তাঁদের কান্না চোরের মা-র কান্না। তাঁরা সবাই সাহিত্যিক অথবা সাহিত্য-সমালোচক অথবা সাহিত্যের অধ্যাপক। আধুনিক সাহিত্য-ব্যবসায়ী যদি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তাহলে তাঁর রুজি-রোজগার মারা যাবার সমূহ সম্ভাবনা। আর অধ্যাপকদের তো ক্লাসে বসে এই বিচিত্র সাহিত্যবস্তুর 'সৌন্দর্য' বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের শোনাতে হয়—কিংবা অদূর ভবিষ্যতে শোনাতে হবে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সত্য কথা বলা তাঁদের পক্ষে high treason-এর সমপর্যায়ভুক্ত।

তবুও এঁরাও মাঝে মাঝে সত্য কথা বলে ফেলেন—তবে তার জন্যে নিভৃতে একান্তে এঁদের বেশ ভাল করে চেপে ধরতে হয়। আমি চেপে ধরেছি—এবং এঁদের সত্যকার মতামত শুনতে পেয়েছি।

তাহলে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এই: ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ক্ষুদে একটা যুগে সাহিত্য-নামধেয় এক জাতীয় বস্তুর উদ্ভব হয়েছে, আমরা অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না—এবং কেন বুঝে উঠতে পারছি না তাও আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কি সেই মানসিক শক্তি যার অভাব ঘটলে হোমর থেকে হুমায়ুন কবির পর্যন্ত কোন সাহিত্যিকের রচনার রসগ্রহণে কোন রকম বাধার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু তৎপরবর্তী আধুনিক সাহিত্যের গুহায় প্রবেশ একেবারে অসাধ্য হয়ে ওঠে?

ঐ 'আধুনিক' কথাটার মধ্যেও এমন কোন ম্যাজিক নেই যার সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সাহিত্যের আধুনিকত্ব কোন স্থায়ী লক্ষণ নয়। আজ যে সাহিত্য আধুনিক, কাল তা অনাধুনিক—হোমরের কাব্যও একদিন আধুনিক কাব্য ছিল। তা ছাড়া এই আধুনিকত্ব গুণটির মধ্যেই বা এমন একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য

নিহিত থাকবে কেন যার ফলে আধুনিক যুগের মানুষ হয়েও আধুনিক সাহিত্য আমরা বুঝতে পারব না ?

আমাদেরই হাতে-গড়া পথ-সেতু-প্রাসাদ নিত্য ব্যবহার করতে আধুনিক সাহিত্যিকদের মনে কোন দ্বিধা হয় না ; আমাদের হাতে-লেখা প্রেসৃক্রিপ্‌শনের ওষুধ খেয়ে অনেক মরণাপন্ন আধুনিক সাহিত্যিক পুনর্জীবন লাভ করছেন ; বিদ্যালয়ে আমাদেরই কাছে শিক্ষালাভের জন্য আধুনিক সাহিত্যিকেরা নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের ছেলে-মেয়ে-নাতিপুতিদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন ; আমাদেরই দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়- অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে একটা মোটা মাইনের চাকরি যোগাড় করবার জন্যে আধুনিক-সাহিত্যিক উমেদারের অভাব নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা সকলেই যে মহামূর্খ কিংবা জড়বুদ্ধি কিংবা উন্মাদ আধুনিক সাহিত্যিকেরাও সে কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা সব করতে পারি, আমরা সব বুঝতে পারি—শুধু তাঁদের রচিত সাহিত্যের মর্মগ্রহণের বেলাতেই অনধিকারী প্রমাণিত হয়ে গেলাম ! সর্বকালীন সাহিত্য থেকে আনন্দ আহরণে আমাদের কোন বাধা নেই, শুধু আধুনিক সাহিত্যের দরজাই আমাদের সামনে রুদ্ধ হয়ে থাকবে !

কেন এমন হয় ? কেন এমন হবে ?—দোষ কার ?

দোষ আমাদেরই। সমস্যার সমাধান যে করে দিল সে সম্পর্কে আমার নাতি হয়—ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার ক্লাসে বাংলা পড়ে, সবে সিগ্রেট ধরেছে।

বলল, 'দাদু, তুমি আধুনিক সাহিত্য বুঝবে কি করে ? তুমি তো ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নও।'—শ্যাম্পু-করা মাথায় একটা তাচ্ছিল্যের ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল।

আমি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নই—একথা নিজের কাছে স্বীকার করা খুব সহজ হয় নি আমার পক্ষে—কারও পক্ষেই তা হয় না। সুতরাং আবার একবার আধুনিক সাহিত্যের সাধনায় মেতে উঠলাম। মাসের

পর মাস কাটিয়ে দিলাম শুধু আধুনিক কাব্য ও গল্প-উপন্যাস এবং তৎসম্পর্কীয় আধুনিক সমালোচনা পড়ে। ফল কিছুই হল না—অন্ধকার অন্ধকারই রয়ে গেল; শুধু আহারে রুচি গেল, রাত্রে নিদ্রা গেল, রক্তের চাপ বেড়ে উঠল, বুক-ধড়ফড়ানি দেখা দিল—আর দুটো সত্য কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম:

আমি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নই; এবং—

আধুনিক সাহিত্য পড়ে কেউ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হতে পারে না, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হবার পর আধুনিক সাহিত্য পড়তে হয়।

তখন গেলাম গুরুদেবের কাছে।

[আমার এই গুরুদেবটি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। মহাপণ্ডিত—দুই বৎসর আবগারীর দারোগা ছিলেন, দুই বৎসর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন, দুই বৎসর কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালিয়েছিলেন। এখন পৈতৃক বাড়ি ও বস্তির খাজনা আদায় করেন, গেরুয়া পরেন ও গাঁজা খান।]

সব কথা শুনে বললেন, 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল তো হতে চাচ্ছিস, কিন্তু ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কাকে বলে জানিস্? কথাটার মানে বুঝিস্?'

আমতা আমতা করে বললাম, 'কেন—ইন্‌টেলেক্‌ট্ মানে বুদ্ধিবৃত্তি—ধীশক্তি—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'ছাই বুঝেছিস্। এখন চুপ করে বোস্—আমি যা বলি মন দিয়ে শোন্:—

ইন্‌টেলেক্‌ট্ বা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের কোন সম্পর্ক নেই। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কথাটা যৌগিক বা যোগরূঢ়ী নয়, সম্পূর্ণভাবে রূঢ়ী—রূঢ়ভাবে জীবন থেকে ইন্‌টেলেক্‌ট্‌কে বিদায় দিয়ে তবে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হতে হয়।

ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাদের পাৎলুনে, হাওয়াই শার্টে, কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে, হাত-পা নাড়ার কারসাজিতে ও অনর্গল কথা বলার ক্ষমতায়।

খাঁটি ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা মন, মগজ প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। তাদের রচিত সাহিত্যে তাই শুধু আঙ্গিকেরই জয়জয়কার। তাদের জীবনেও প্রেম তাই শুধু অঙ্গসর্বস্ব বস্তু।

এদের একমাত্র ধর্ম অস্বীকৃতি ; এদের ধারণা বড়কে ছোট করতে পারলেই এরা বড় হয়ে উঠবে।

এদের জীবনে কোন পেশা না থাকলেও চলে (যদি অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঋণগ্রহণকে পেশা বলে না ধরা হয়)— কিন্তু নেশা একটা থাকা চাই-ই।

ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল জীবনের তথা সাহিত্যের একমাত্র মৌল প্রেরণা যৌন প্রেরণা। কিন্তু এ জীবনের লাম্পট্যে কোন উত্তেজনা নেই, এ সাহিত্যের অশ্লীলতায় কোন উত্তাপ নেই।—They take their pleasure sadly.

এদের সাহিত্যে কোন ভাববস্তু নেই, যা আছে তাকে অভাববস্তু ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ভাষার বিরুদ্ধেও তাদের বিষম ক্রোধ, কারণ ভাষা বোধগম্যতার সহায়তা করে প্রকারান্তরে বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন করে।

একমাত্র দলগঠন ও প্রতিষ্ঠা-অর্জন সংক্রান্ত নৈপুণ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ নৈপুণ্যের প্রয়োজন এরা স্বীকার করে না—সাহিত্যিক ও শৈল্পিক নৈপুণ্যকে দস্তুরমত ঘৃণা করে।

এরাই বীট্‌নিকদের পূর্বপুরুষ……'

বুঝলাম গুরুদেবের নেশা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, সহজে তাঁর বকবকানি আজ থামবে না। আমার সমস্যা সমাধানে তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না।

তাই বাধ্য হয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।—

আমার একুশ বছর বয়সের নাতিটি যা এত সহজে হতে পেরেছে আমার পক্ষে তা হওয়া অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হবে কেন ?……

বলতে পারেন, কি করলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হওয়া যায় ?

॥ সাত ॥

আমার পরিচিত একজন বাঙালী সাহিত্যিক তাঁর কোন দিল্লীপ্রবাসী বন্ধুকে স্বরচিত একখানি গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থখানি উপন্যাস ঃ বন্ধুটি বহুভাষাবিৎ ও মহাপণ্ডিত।

কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুর কাছ থেকে চোস্ত ইংরেজিতে লেখা একখানি দীর্ঘ সমালোচনা-পত্র এসে পৌঁছল। এই পত্রখানি আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে। সমালোচনার মধ্যে বিশেষ চমকপ্রদ বা অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। মৃদু নিন্দা ও মৃদু প্রশংসার সংমিশ্রণ—ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতীয় সাহিত্যিক বন্ধুকৃত্যের সেই অতি পরিচিত চর্বিত-চর্বণ।

কিন্তু পত্রের মধ্যে এমন একটি মন্তব্য ছিল যা সাহিত্যিক ভদ্রলোককে রীতিমত বিক্ষুব্ধ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। প্রতিবাদ-পত্র লিখে পণ্ডিত বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে তোলার সাহস নেই, তাই অনেকক্ষণ ধরে আমার কাছে বসে বসে অনেক কাঁদুনি গেয়ে গিয়েছিলেন।

মন্তব্যটি এই ঃ 'Your characters are all—oh so Bengalee! (আপনার সমস্ত চরিত্রগুলি আপাদমস্তক বাঙালী, অথবা বাঙালিয়ানায় ভরপুর!)'

বলা বাহুল্য মন্তব্যটি নিন্দাত্মক। এই নিন্দার প্রত্যুত্তরে সাহিত্যিক ভদ্রলোক সেদিন যে জবাবদিহি করে গিয়েছিলেন, তাঁরই ভাষায়, কিন্তু পুনরুক্তিবর্জিত সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

'কি মুস্কিল, দেখুন তো মশাই! আমি বাঙালী—আমার বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই বাঙালী। আজন্ম বাংলা দেশে মানুষ; খুব সম্ভব বাংলা দেশেই মরব। ছা-পোষা গেরস্ত—বিলেত বা আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার নামই শুধু শুনেছি। দেশভ্রমণের দৌড় মিহিজাম জামতাড়া মধুপুর গিরিডি, কিংবা বড়জোর রাঁচি পুরী

বা বেনারস পর্যন্ত। যাদের জন্যে লিখি তারা সবাই আমারই মত সাধারণ বাঙালী। বাঙালী সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজ চিনি না; বাংলাদেশের মানুষ ছাড়া আর কারও সম্বন্ধে লিখতে গেলে হাত কাঁপে—তাদের মনের খবর আমি কতটুকু রাখি বলুন তো! আমি উপন্যাস লিখি, মানুষের জীবন নিয়েই আমার কারবার। সাধারণ বাঙালীর জীবন ছাড়া আর কারও জীবন নিয়ে লিখতে যাওয়া কি আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হবে না? ঐতিহাসিক উপন্যাস আমার হাতে তেমন ওতরায় না। আমার সব বইএর সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রই বাঙালী—তাদের জীবনের হাসি-কান্না, ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্ব, সমস্যা সমাধান, সবই বাঙালীর সাধারণ জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া তারা প্রায় সবাই সাধারণ মানুষও বটে—উপন্যাসের পাতায় অতি-মানবের হাট বসানোর পক্ষপাতী আমি নই। এমন অবস্থায় আমার বইএর চরিত্রগুলি oh so Bengalee! হবে না তো কি হবে? আর তাতে দোষেরই বা কি আছে? কই, Jane Austen-এর "Emma" অথবা Balzac-এর "Father Goriot" অথবা Tolstoi-এর "Anna Karenina"-র চরিত্রগুলোকে তো কেউ oh so English! কিংবা oh so French! কিংবা oh so Russian! বলে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করে না!'

বস্তুত এমন সরলপ্রাণ সাহিত্যিক আমি আর কখনও দেখি নি। তিনি সহজ কথা সহজ করে ভেবেছেন এবং যা ভেবেছেন সহজ ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যদি ওয়াকিবহাল ব্যক্তি হতেন তাহলে বুঝতে পারতেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তিনি নিজের জন্যে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন এবং একজন সমালোচক সেই নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেছেন—বিষয়টা যদি মাত্র এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে তা নিয়ে আলোচনা করার আদৌ কোন প্রয়োজন হত না। ব্যক্তিগত রুচির বিরুদ্ধে কোন আপীল নেই। কত লোকের তো

ইলিশ মাছ ভাল লাগে না, ঘন দুধ ভাল লাগে না, ন্যাংড়া আম ভাল লাগে না। তা নিয়ে কি আমরা কোন নালিশ তুলতে যাই? সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রকাশ্য ব্যক্তিগত রুচিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়াই ভাল।

কিন্তু দিল্লীওয়ালা বন্ধুর বিরূপ মন্তব্যটি যে মানসিকতার ফসল তার শিকড় ব্যক্তিগত রুচির খাসবাগিচায় নিহিত নেই, তার সন্ধানে আমাদের নামতে হবে গোষ্ঠীচিন্তার অন্ধগুহায়।

সাহিত্যিক ভদ্রলোকটি হয়তো খবর রাখেন না, সম্প্রতি আমাদের দেশের সাহিত্যচিন্তার আসরে একদল অতিবিদগ্ধ তরুণ ও নাতিতরুণের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা নিজেদের 'কস্‌মোপলিটান' বলে ভাবতে ও প্রচার করতে শুরু করেছেন। (কথাটির কোন বাংলা অনুবাদ ব্যবহার করার চেষ্টা করব না, কারণ এক্ষেত্রে আমার হাতের অনুবাদ হয়তো গালাগালির শামিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।) এই সব কস্‌মোপলিটান সাহিত্য-সমালোচকদের মতে বাংলা গল্প-উপন্যাসে বাঙালিয়ানার আধিক্য, এমন কি অস্তিত্ব থাকাও মহাপাপ। এঁদের একমাত্র চিন্তা বিশ্বচিন্তা, একমাত্র বেদনা বিশ্ববেদনা, একমাত্র প্রীতি বিশ্বপ্রীতি। বিশ্বমানব ছাড়া অপর কোন মানবের সুখদুঃখ এঁদের কাছে একান্ত তুচ্ছ বস্তু। বাংলা সাহিত্যে বাঙালিয়ানা থাকবে না, ইংরেজী সাহিত্যে ইংরেজিয়ানা থাকবে না, ফরাসী সাহিত্যে ফরাসিয়ানা থাকবে না, ইয়াঙ্কী সাহিত্যে ইয়াঙ্কিয়ানা থাকবে না; সর্বদেশের সাহিত্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে শুধু একই লক্ষণের দ্বারা—জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতিবিচ্যুত মাংসল বস্তুবাদের দ্বারা, অথবা জল-বায়ু-মৃত্তিকার সংস্পর্শশূন্য ফাঁকা চিন্তাবিলাসের দ্বারা। আদর্শ বিশ্বসাহিত্য বলতে এঁরা এই ধরনের বস্তুই বুঝে থাকেন।

বাঙালী কস্‌মোপলিটান সাহিত্যিকেরা সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এঁরা কিছুই লেখেন না, কিন্তু এমন ভাব দেখিয়ে বেড়ান যে ইচ্ছে করলেই প্রত্যেকে

এক-একখানা যুগান্তকারী মহাগ্রন্থ যখন তখন লিখে ফেলতে পারেন—যা পড়ে বিশ্বজনের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁরা বাংলা ভাষায় কিছু কিছু 'আলোচনামূলক নিবন্ধ' রচনা করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। এঁদের লেখার ভাষা ও বক্তব্য এঁরা নিজেরা ছাড়া আর বড় একটা কেউই বুঝতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীতে আছেন অল্প কয়েকজন। এঁরা, কেন জানি না, হঠাৎ ইংরেজী ভাষায় দুই-একখানা বই লিখে ফেলেন; এবং দুই-একজন ইংরেজী লেখক ও সমালোচক বিদেশীর এই স্পর্ধিত প্রচেষ্টাকে সকৌতুক করুণার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে একটু তারিফ করেন, হাততালি দেন—যেমন আমরা তারিফ করে থাকি, হাততালি দিয়ে থাকি বেড়ালকে বেহালা বাজাতে দেখলে।

এঁদের পাণ্ডিত্য আছে বিদ্যা নেই, শিক্ষা আছে সংস্কৃতি নেই, অভিজ্ঞতা আছে জ্ঞান নেই, ফুল ফল সবই আছে কিন্তু শিকড় নেই। এঁরা শুধু নামেই কস্‌মোপলিটান (যার অনুবাদ করতে আমি অক্ষম) —সত্যকার বিশ্বজনের এঁরা কেউ নন, সত্যকার বিশ্বসাহিত্যের ভোজসভায় এঁরা অপাংক্তেয়।

বিশ্বসাহিত্যের নিজস্ব কোন 'বিশ্ববৈশিষ্ট্য' নেই। নানাদেশের ও নানা জাতির সাহিত্যের দেশীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি দিয়েই তার চরিত্র গঠিত হয়। তাই তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই এত সুমহান। কিন্তু কস্‌মোপলিটান দৃষ্টি সমষ্টির এই বিপুল মহিমা দেখতে পায় না, তার পরিবর্তে গড়ে তুলতে চায় নানা মহৎ উপাদানের গ. সা. গু. জাতীয় একটা শীর্ণ কঙ্কালের কাঠামো।

কাজেই বাংলা সাহিত্যের বাঙালিয়ানা এঁদের সহ্য হবে কেন?

কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাংলা দেশের যে অর্ঘ্য সব চেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে (এবং একদিন না একদিন হবেই) তা হবে বাংলার জলমাটির নিজস্ব ফসল, তার সর্বাঙ্গে থাকবে বাঙালিয়ানার গন্ধ।

[প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ল। আজকাল স্বদেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে ইংরেজী ভাষায় লেখা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় দুই একটি 'আলোচনামূলক নিবন্ধ' প্রকাশিত হয়ে থাকে। এগুলির অধিকাংশই উক্ত কস্‌মোপলিটানদের দ্বারা রচিত। লক্ষ্য করে দেখবেন, এই সব নিবন্ধে এমন অনেক বাংলা লেখক-লেখিকাদের নিয়ে সাতকাহন করা হয়ে থাকে যাঁদের নাম বাংলাদেশের পাঠক-সম্প্রদায় কখনও শোনেন নি, পুস্তক-প্রকাশকেরাও ভুলতে বসেছেন। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখমাত্রও কোথাও দেখতে পাবেন না। বিভূতিভূষণের রচনা আপাদমস্তক বাঙালিয়ানায় ভরপুর। এই তাঁর অপরাধ—এই জন্যেই তিনি কস্‌মোপলিটান কলমের অস্পৃশ্য বস্তু।]

যে হতভাগ্য নিজের বাপ-মাকে, নিজের ছেলেমেয়েকে ভালোবাসতে শিখল না, সে বিশ্বমানবকে ভালোবাসবে কি করে? বহু লোকের বাপ-মা আর ছেলেমেয়ে নিয়েই তো বিশ্বমানব গড়ে উঠেছে।

যে নিজের গ্রাম বা নগর সম্বন্ধে উদাসীন, সে যদি সহসা বিশ্ব-সচেতনতার বাণী প্রচার করতে বসে, তাহলে তাকে উন্মাদ অথবা ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছু মনে করবার কোন হেতু আছে কি?

বহু খণ্ড খণ্ড পরিবারচিন্তা ও সমাজচিন্তার নদীনালার পথ বেয়েই বিশ্বচিন্তার সাগরে গিয়ে পৌঁছনো যায়। অন্য কোন পথ নেই।

সিঁড়ির প্রথম ধাপগুলি যার নজরেই পড়ল না বা অবহেলার বস্তু হয়ে রইল সে যদি সহসা নিজেকে উচ্চতম ধাপে সমাসীন বলে ঘোষণা করতে থাকে, তাহলে তার কথা আমরা বিশ্বাস করব কেন?

শিল্পের বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কথাটি আরও একটু জোর দিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে।

বাঙালী শিল্পী বা সাহিত্যিক আমি। জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার অপরিচিত কোন সাধারণ বাঙালী

সহযাত্রীর দুই চোখে দুই বিন্দু অশ্রু। বাঙালিয়ানার মর্মকেন্দ্রসমুখ ঐ দুই ফোঁটা চোখের জলের মূল্য ও মর্যাদা আমাকে দিতেই হবে, ওদের রহস্য ও তাৎপর্য আমাকে বুঝতেই হবে। তা যদি না পারি, তাহলে বুঝতে হবে সাহিত্য ও শিল্পের পথ আমার জন্যে নয়।

বিশ্ববেদনার নিগূঢ়ার্থ ঐ দুই ফোঁটা চোখের জলের মধ্যেই নিহিত আছে।

সাহিত্যিক বা শিল্পীর একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে তাঁর কাছে—the part is always equal to, and sometimes greater than, the whole.

॥ আট ॥

বন্ধু বিদ্বান, বিদগ্ধ—এবং বিলাতফেরত।

দিবারাত্র বই পড়েন, কিন্তু বাংলা বই পড়েন না।

একদিন মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেললাম কথাটা। বন্ধু গম্ভীরমুখে আমার নালিশ শুনলেন, তার পর সূক্ষ্ম একটু হাসি হেসে বললেন, 'দেখ হে, একেবারেই যে বাংলা পড়ি নি তা নয়। পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পড়তে পারি নি।—কেন জান?'

সবিস্ময়ে মাথা নেড়ে জানালাম, জানি না।

'তোমাদের বাংলা সাহিত্যের আগা-পাস্তলা শুধু সেন্টিমেণ্ট্ দিয়ে বোঝাই—তোমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, শুধু "হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস।" আমি সেন্টিমেণ্ট্ সহ্য করতে পারি না। ও সম্বন্ধে আমার একটা inhibition আছে।'—বন্ধুর কণ্ঠস্বরে আত্মসন্তুষ্টির সুস্পষ্ট আভাস।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'কথাটা আপনি নেহাৎ মিথ্যা বলেন নি। আমরা বাঙালীরা একটু ছিঁচকাঁদুনে জাত—সস্তা ভাবালুতায় সহজেই ভুলে যাই। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকেরা সবাই তো—'

বাধা দিয়ে বন্ধু বললেন, 'ভুল বুঝলে হে। আমি সেন্টিমেণ্টা-লিজ্‌মের কথা বলছি না, বলছি সেন্টিমেণ্টের কথা—মেয়েলী মিন্‌মিনে মনোবৃত্তিগুলোর কথা। বাংলা সাহিত্য এতদিনেও সাবালক হতে পারে নি। তোমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের কথাই ধর। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেন্টিমেণ্ট-বিলাসের সম্রাট। বিশ্বাস না হয় তাঁর কমলাকান্ত, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইলের পাতাগুলো উলটে দেখ। তবু তিনি সেকালের লোক—নাবালক সাহিত্যের পায়োনিয়ার: তাঁকে না হয় মাপ করা গেল। কিন্তু পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র, বিভূতি-ভূষণই বা কি করেছেন? সেন্টিমেণ্ট বাদ দিলে তাঁদের লেখায় থাকে

কি? এই সব সেন্টিমেন্টসর্বস্ব গল্প-উপন্যাস পড়ে পড়েই জাতটা গোল্লায় গেল।'

ভয়ে ভয়ে আপত্তি তুললাম, 'কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যেও তো ডিকেন্‌স্, থ্যাকারে, শার্ল্ট্ ব্রন্টি—'

'ওঁদের কথা ছাড়। তখন ইংরেজী সাহিত্যও নাবালক ছিল। আর কোন ভাষা তো জান না, আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যটাই ভাল করে পড়ে দেখ। আধুনিক সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে সেন্টিমেন্ট-বর্জিত হতে হবে। তাকে শুধু বস্তুনিষ্ঠ হলে চলবে না, মনে প্রাণে বস্তুবাদী হতে হবে—বর্তমান দুনিয়াকে মেনে নেবার শক্তি অর্জন করতে হবে, tough হতে হবে। এই toughness-ই হল আধুনিক সাহিত্যের, অর্থাৎ সাবালক সাহিত্যের সর্বপ্রধান লক্ষণ।'

বিভ্রান্তচিত্তে ঘরে ফিরে এলাম, এসেই ইংরেজী অভিধানখানা খুলে বসলাম। 'সেন্টিমেন্ট' শব্দটার অর্থ লেখা রয়েছে—'a tendency or view based on or coloured by emotion,' অর্থাৎ 'চিত্তাবেগভিত্তিক অথবা চিত্তাবেগ দ্বারা প্রভাবিত মানসিক প্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গি।' সংজ্ঞাটা একটু গোলমেলে মনে হল—কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে হল। তার পর মনে মনে দুটো ফর্দ খাড়া করে ফেললাম।

দয়া মায়া মমতা করুণা, প্রেম প্রীতি বন্ধুত্ব সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ভক্তি উপাসনা, ধর্মনিষ্ঠা নীতিনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠা, পরার্থপরতা দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গ—এ সবই হল সেন্টিমেন্ট।

(অকারণ) ক্রোধ ও বিদ্বেষ, (সুপরিকল্পিত) নিষ্ঠুরতা প্রতিহিংসা ও বীভৎসতা, স্বার্থপরতা নীতিহীনতা ও অধার্মিকতা, রিরংসা ধর্ষকাম ও মর্ষকাম, (আত্মতৃপ্তির জন্যে) অর্থলিপ্সা ক্ষমতালিপ্সা ও পরপীড়ন—এর একটাও সেন্টিমেন্ট নয়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবলাম। নাঃ, বন্ধু ঠিকই বলেছেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য সত্যই tough হয়ে উঠেছে—

বন্ধুর মতে সাবালক হয়ে উঠেছে। আধুনিক ইংরেজী কথাসাহিত্যিকেরা সত্যই অতি যত্নে সর্বপ্রকার সেন্টিমেণ্টের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলেন।

আধুনিক ইংরেজী গল্প-উপন্যাসের কোন চরিত্র পরের দুঃখে অথবা দুর্দশায় কখনও কাতর হয়ে পড়ে না—কদাপি করুণায় কিংবা মমতায় কিংবা সমবেদনায় অভিভূত হয় না। পরের দুঃখ নিরসনের জন্যে তার নিজের কিছু করবার থাকতে পারে একথা সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে অস্বীকার করে। বড়জোর সে একদল লোকের দুঃখ দেখে অপরূপ ক্রোধানন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে—আর এক দল লোকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চায়। বিপরীতমুখী দুই দফা পরপীড়নের ফলে যে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে তাই তার একমাত্র কাম্য পরিস্থিতি।—কিন্তু এ হল Angry Young Man-দের কথা। তারা এখনও সম্পূর্ণরূপে 'সাবালক' হয়ে উঠতে পারে নি। সত্যিকারের tough আধুনিক যাঁরা, তাঁরা পরের দুর্দশা দেখে শুধু একবার দুটি কাঁধে মৃদু একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সাম্প্রতিকতম call girl-টির সঙ্গে date রক্ষা করতে চলে যান।

সুন্দরী কোন তরুণীকে দেখে কারও মনে কোনরকম অজৈবিক হর্ষ উৎপন্ন হল, অথবা সূক্ষ্মানুভূতিসঞ্জাত আত্মদানস্পৃহার উদ্ভব হল—এ জাতীয় বর্ণনা আধুনিক ইংরেজী কথাসাহিত্যে কোথাও মিলবে না। তার বদলে পাবেন অদম্য রিরংসা—দৈহিক উপভোগস্পৃহা, অথবা সুন্দর বস্তু আত্মসাৎ করার অদম্য লোভ। বিবাহিত প্রেম ও 'বিবাহের চেয়ে বড়' প্রেম—দুইএরই উৎসভূমি এক। বুড়োবুড়ি ছোঁড়া-ছুঁড়ী কারও ধারণায় প্রেমজীবনের কোন স্থান নেই—সকলেই শুধু যৌন-জীবনের জন্যে পাগল। ফলে সেই বিখ্যাত 'চার অক্ষরের শব্দগুলি' সাহিত্যে শুধু জলচল হয় নি, দস্তুরমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা অবগত আছেন আজকাল ইংরেজী ভাষায় 'making love' কথাটার কি অর্থ দাঁড়িয়েছে। নাবালক সাহিত্যিক ডিকেন্স্ বা থ্যাকারে (এমন কি হার্ডি-গল্স্ওয়ার্দিও) কি এই কথার এই অর্থ কল্পনা করতে পারতেন?

যৌনজীবনের উপজাত বস্তু হিসাবে পুত্রকন্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাপ-মা তাদের যত্ন নিতে, তাদের খাওয়া-পরা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু পুত্রকন্যার সেরকম কোন দায়িত্ব নেই। সুতরাং তারা সাবালক হলেই বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে যে-যার পথ দেখবে—এই স্বাভাবিক। (পথ-কুকুরদের মধ্যেও এই নীতি প্রচলিত আছে, তবে তাদের বাপ-মায়ের দায়িত্ব অত বেশি নয়।) সুতরাং ছেলেমেয়ে বুড়ো বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে বা তাদের সাহচর্য দেবে—এ নিছক সেন্টিমেণ্ট ছাড়া কিছুই নয়। আধুনিক ইংরেজী গল্প-উপন্যাসে এমন ব্যাপার কুত্রাপি দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুত এসব গ্রন্থের যারা নায়ক তাদের যে বাপ-মা আছে অথবা কোন দিন ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

এই সব গল্প-উপন্যাসের নায়কেরা নিঃসঙ্কোচে ব্যভিচার ও অগম্যাগমন করে বেড়ায়, সামান্য কারণে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নরহত্যা করে, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করে, দেশপ্রেমের কথা শুনলে হাসে—আত্মসুখের জন্যে এরা করতে পারে না এমন কর্ম নেই। অথচ এদের বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই, সুতরাং অনুশোচনাও নেই (দুটি বস্তুই বোধ হয় সেন্টিমেণ্ট)। নব-মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান থেকে নিজেদের প্রত্যেকটি পাপকর্মের চমৎকার একটি করে কৈফিয়ত এরা খুঁজে বের করতে পারে। অথচ এদের যদি সাহিত্যে আমরা দেখতে না চাই, এদের প্রতি ঘৃণাবোধ করি, তাহলেই আমাদের সেন্টিমেণ্টবিলাসের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে।

এই হল আধুনিক ইংরেজী কথাসাহিত্যের—সাবালক কথা-সাহিত্যের, tough কথাসাহিত্যের সত্যকার রূপ।

কিন্তু—what England thinks today Bengal thinks tomorrow. ইংলণ্ড যখন তলিয়েছে তখন বাংলা ডুবতেই বা কদিন? আমাদের আধুনিক সাহিত্যের প্রেরণা তো সাগরপার থেকেই এসে থাকে।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সামগ্রিক রূপটা একবার চট্‌ করে পর্যালোচনা করে নিলাম। হ্যাঁ—দেখা দিয়েছে প্রাথমিক লক্ষণগুলোর কিছু কিছু। সাবালকত্বের প্রথম ধাপে পা দিয়েছে বাংলা দেশের গল্প-উপন্যাস। সেন্টিমেণ্ট-বর্জনের পালা শুরু হয়ে গেছে এখানে ওখানে গলিতে ঘুঁজিতে। কিন্তু গলিঘুঁজির আবর্জনা সদর রাস্তায় এসে পড়ার সম্ভাবনাকে তো এড়িয়ে চলার উপায় নেই।

সেদিন রাত্রে ঘুম হল না।......

পরদিন সকালে উঠেই ছুটলাম গুরুদেবের কাছে। গিয়ে দেখলাম গুরুদেব তখনই গাঁজার কলকে নিয়ে বসেছেন।

করজোড়ে নিবেদন করলাম সব কথা। তার পর জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন আপনি বলে দিন, কেন সাহিত্যে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার ছবি দেখে শিউরে ওঠা অপরাধ নয়? কেন ন্যক্কারজনক অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের বর্ণনা পড়ে জুগুপ্সিত হওয়া অপরাধ নয়? অথচ কেন পরের দুঃখের বর্ণনা পড়ে চোখে জল আসা ও গলা ধরে ওঠা অপরাধ? কেন আদর্শবাদের আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠা মহা অপরাধ?—সেন্টিমেণ্ট সম্বন্ধে inhibition থাকা এতবড় একটা গৌরবের বস্তু কেন? আমি যদি ঐ সাবালক toughness সম্বন্ধেই inhibited হই তাতেই বা দোষের কি থাকতে পারে? কেন এই 'বস্তুবাদ' বড় জিনিস, আর কেনই বা সেন্টিমেণ্ট ছোট জিনিস?'

হাতের কলকেটায় একটা টান দিয়ে গুরুদেব বললেন, 'বলছি—শোন্‌ঃ এই সব বড়-ছোটর বিচার খণ্ড-দর্শন থেকে উদ্ভূত। পূর্ণ-দর্শনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে কিছুই আর বড় থাকে না, কিছুই ছোট থাকে না—সব সমান হয়ে যায়। এই সমদৃষ্টি অর্জনের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে গাঁজা। কয়েক ছিলিম টেনে তার পর বই পড়তে বসবি, দেখবি বড়-ছোটর গোলকধাঁধা ঘুচে গেছে—চোখের সামনে সমদর্শনের স্বর্গরাজ্যের দরজা খুলে গেছে। পাঠক, লেখক ও গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্র সব তখন এক হয়ে যাবে। তখন পাঠক মনে করবে সেই

একাধারে লেখক ও নায়ক, লেখককেও গ্রন্থের চরিত্র মাত্র বলে মনে হবে। তখন যদি পড়িস্, কেউ কাউকে খুঁচিয়ে মারছে এবং এই কর্মে গৌরববোধ করছে, তা হলে তখুনি একখানা খোন্তা নিয়ে ছুটে গিয়ে লেখককে হাটের মাঝখানে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবি। যদি দেখিস্, কোন চরিত্র আপিসের টাকা ভেঙে ঘোড়দৌড় খেলছে, এবং লেখক মনস্তাত্ত্বিক কারণে তার সমর্থন করছেন, তখুনি লেখকের কাছ থেকে হাজার টাকা ধার চেয়ে নিবি—আর কখনও তা শোধ দিবি না। যদি দেখিস্, কোন চরিত্র গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের আড়কাঠ থেকে ঝুলে আছে, এবং লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করছেন, তার কতখানি জিভ বেরিয়ে আছে, আর চোখ কেমন ঠেলে বেরিয়েছে ইত্যাদি, তখুনি একগাছা দড়ি কিনে নিয়ে গিয়ে লেখককে নিকটতম গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে আসবি। আর যদি দেখিস ফ্রয়েডীয় নীতির অমোঘ নির্দেশের ফলে নায়ক ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে, তা হলে তুইও একখানা ফ্রয়েডের বই বগলদাবা করে এক ছুটে লেখকের বাড়ি গিয়ে তার অন্দরে ঢুকে—'

কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে এলাম।

॥ নয় ॥

সম্প্রতি একটা বারোয়ারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভার শোভাবর্ধন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভদ্রতা, বন্ধুত্ব ও বাধ্য-বাধকতার বন্ধন এমনই মর্মান্তিক জিনিস যে শরীর সত্যসত্যই অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অব্যাহতি পাই নি। যেতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বসে থাকতেও হয়েছিল।

সভাগৃহটি পাড়ার জনৈক উকিল ভদ্রলোকের নাতিপ্রশস্ত বৈঠকখানা। তার প্রায় সমস্তটাই দখল করে বসেছিল পাড়ার শিশু ও বালক-বালিকাদের দল। তাদের পিছনে ছিলেন জন দশ-বারো প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোক—সর্বাঙ্গ গরম চাদরে ঝেঁপে আরাম করে দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে পরম অভিনিবেশ সহকারে বোধ হয় সভার কার্যক্রমই অনুধাবন করছিলেন, যদিও আমার মনে হয়েছিল তাঁরা ঝিমোচ্ছেন। তা ছাড়া সভাপতি ছিলেন, প্রধান অতিথি ছিলেন, গায়ক ও বাদক শিল্পীরা ছিলেন, এবং আমার মত ধরে-বেঁধে টেনে আনা জনকতক অপ্রধান অতিথিও ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের যে সব তরুণ সভ্যদের সাহিত্য সংক্রান্ত প্রীতি ও উৎসাহের তাগিদে এই সভার সৃষ্টি তাঁদের কাউকে কিন্তু সভায় দেখতে পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তাঁরা 'অর্গানিজেশন' নামধেয় একটা রহস্যময় ব্যাপার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে সভায় এসে বসা তো দূরের কথা তাঁদের নাকি মরবারও ফুরসত নেই।—মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করার অফুরন্ত অবকাশ শুধু আমাদের মত হতভাগ্যদেরই আছে।

তবলা সঙ্গত সহযোগে ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হল, স্থানীয় নাট্যসংঘের প্রধান অভিনেতা (বোধ হয় ভীমের ভূমিকা নিয়ে থাকেন) 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করলেন, শার্ট-পায়জামা পরা দাড়িওয়ালা

একটি ছোকরা এসে মদ্দা পাতিহাসের মত ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় বই থেকে হরিপদ কেরানির কাহিনী পড়ে শোনাল (অনুষ্ঠান-লিপিতে এটিকেও 'আবৃত্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল), আর হল তিনটি বক্তৃতা।

সভার শেষে এক জন অভ্যাগত ভদ্রলোক দেড় মিনিট কালব্যাপী একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং সভাপতি মহাশয়ের ভাষণে সময় লেগেছিল চল্লিশ সেকেণ্ড।—অবশ্য তাঁদের এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁদের আগে প্রধান অতিথি মহাশয় ঝাড়া দু ঘণ্টা একটানা এমন বক্তৃতা একটা দিয়েছিলেন যে তার ফলে শিশু ও বালক-বালিকার দল ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল এবং দেয়াল ঠেস-দেওয়া চাদরমুড়ি-দেওয়া ভদ্রলোকদের নাকগুলি প্রকাশ্য নির্লজ্জতার সঙ্গে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু আমাকে এই বক্তৃতার আদ্যন্ত শুনতে হয়েছিল।—বোধ হয় একমাত্র আমিই তা শুনেছিলাম। সে যন্ত্রণা সহজে ভুলতে পারব না। তাই তখনকার চেপে-রাখা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি এখন কিছু পরিমাণে চরিতার্থ করে নিতে চাই।

এই প্রধান অতিথি ভদ্রলোকটি এক জন অধ্যাপক, তা ছাড়া মেজ-সেজো পর্যায়ের আধুনিক কবি ও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেও কিছু খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন। ইংরেজিতে যাকে gift of the gab বলে তাতে সত্যই তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। অনর্গল-ভাষণের সাম্রাজ্যে তিনি অবিসংবাদী শাহান-শাহ্।

তাঁর এই সুদীর্ঘ বক্তৃতাবাজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রশস্তি-কীর্তন। আধুনিকদের মধ্যে কোন বিশেষ বিশেষ কবির রচনার প্রশংসা তিনি করেন নি—তাঁর মতে, গোটা আধুনিক কাব্যপন্থাটাই উচ্চতম প্রশংসার যোগ্য। আধুনিক যুগের পূর্বে যাঁরা বাংলা কবিতা লিখে গেছেন তাঁরা সকলেই হয় সম্পূর্ণ ভুল, না হয় নিকৃষ্টতর কাব্যপন্থা অনুসরণ করেছেন। ফলে আধুনিক কাব্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ তাঁদের সকলের কাব্যই নেহাত

জলো ফিকে পান্‌সে পদার্থ। যে সব পাঠক বা সমালোচক এই অপকৃষ্ট সামগ্রী পড়ে আনন্দ পায়, আধুনিক কাব্য পড়ে পায় না, তারা সবাই বুদ্ধি রুচি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অতি হীন স্তরের জীব—অর্থাৎ এক কথায় গণ্ডমূর্খ।

কিন্তু এ সবই হল উক্তি। যুক্তি বলতে যা বোঝায় কথার তুব্‌ড়িবাজির মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। তবু যতটা বুঝতে পারলাম—তিনটি যুক্তির উপর তিনি তাঁর সমস্ত বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছিলেন। সে তিনটি হল এই :

(১) আধুনিক বাংলা কাব্য দুরূহ ঠেকে শুধু তাদেরই কাছে যাদের মন শ্রমবিমুখ ও আরাম-প্রয়াসী। কাব্যরস উপভোগের জন্যে কিছু শ্রমস্বীকার করতে হয়।

(২) আধুনিক কাব্য আধুনিক যুগমানসেরই অভিব্যক্তি, সুতরাং আধুনিক যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কাব্য।

(৩) যাঁরা আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা ভুলে যান যে রবীন্দ্রনাথকেও এক দিন প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এই যুক্তিগুলো শুধু এই এক বার নয়, এর আগেও বহু বার আমাকে শুনতে ও পড়তে হয়েছে। আপনাদের অনেককেও হয়তো হয়েছে। সেদিনকার 'সভা'য় এগুলোর জবাব দিতে প্রবৃত্তি হয় নি, কিন্তু জবাব দেওয়া দরকার। আমার জবাবগুলো দফাওয়ারি ভাবে নীচে লিপিবদ্ধ করছি।

(১) কাব্যরসপিপাসু পাঠকসমাজ কোন দেশে কোন কালে শ্রমবিমুখ নয়। তা যদি হত তা হলে দান্তের মহাকাব্য, গ্যেটের নাট্যকাব্য, ব্লেকের আর্ষকাব্য, শেলীর স্বপ্নকাব্য, ব্রাউনিং-এর জীবনকাব্য—সবই চিরকাল অপঠিত রয়ে যেত। কিন্তু কাব্যপাঠের ফলশ্রুতিতে পাঠক চায় কিছু আনন্দ। চাষের পরিশ্রম করতে মানুষ সব সময়েই রাজী আছে যদি সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে ফুলের বা

ফলের বা শস্যের ফসল সে লাভ করে। কিন্তু ফণিমনসা বা শিয়াল-কাঁটার ফসলের জন্যে কে লাঙল ঠেলতে বা কোদাল কোপাতে চায় বলুন? আধুনিক বাঙালী পাঠক আধুনিক কাব্য পাঠ ছেড়ে দিয়েছে, কারণ সে বুঝতে পেরেছে আধুনিক কাব্য মধুচক্র নয়, ভিমরুলের বাসা—ওর মধ্যে শুধু হুলই আছে, মধু একফোঁটাও নেই। মধুর সন্ধান পেলে পরিশ্রম তো সামান্য বস্তু, গাঁটের কড়িও সে খরচ করতে প্রস্তুত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ লাভের জন্য সাতচল্লিশ হাজার দরখাস্তই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) যুগমানস বস্তুটির সঙ্গে যুগমানুষের কিছু সম্পর্ক আছে বলে মনে করি। যুগমানুষ যা চায়, যুগমানুষ যা থেকে আনন্দ পায়, যুগমানুষ যা ভাবে বা অনুভব করে বা স্বপ্ন দেখে, যুগমানুষের হাসি, যুগমানুষের অশ্রু—এই সব মিলিয়েই কি যুগমানস রচিত হয় না? পাশ্চাত্ত্য মুলুকের কথা বলতে পারি না (যদিও ইংলণ্ডে বেজ্‌ম্যানের কাব্যের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও-দেশের আধুনিকদেরও দস্তুরমত ভাবিয়ে তুলেছে), কিন্তু বাংলাদেশের যুগমানুষ যে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক কাব্যকে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করেছে এ কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? যে কোন একখানা পুরানো ঢাউস ধরনের শারদীয়া পত্রিকা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। দেখতে পাবেন, গল্প-প্রবন্ধাদির পৃষ্ঠাগুলো বহু হস্তের স্পর্শ-কলঙ্কে ধূলিমলিন ও জীর্ণ হয়ে গেছে। তার পর পাইকা-টাইপ-সজ্জিত কবিতাবলীর পৃষ্ঠাগুচ্ছটি একবার উলটে পালটে দেখুন। এখনও ধব্‌ধব্‌ করছে সাদা—"অস্বাদিত মধু যেমন, যূথা অনাঘ্রাতা।"—কেউ পড়ে নি। বস্তুত ও-বস্তু কেউ পড়ে না—যে সব সম্পাদক যত্ন করে ওগুলিকে নিজ নিজ পত্রিকায় ছাপেন তাঁরাও পড়েন না।—যে বস্তুকে যুগমানুষের মন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তাকে যুগমানসের অভিব্যক্তি বলে চালানোর চেষ্টাকে জুয়াচুরি ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়?

(৩) এই যুক্তিটি যাঁরা দেন তাঁরা হয় অতীতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর না হয়তো জেনেশুনে মানুষকে ধাপ্পা দিতে চান। কাব্যবিশারদই বলুন, আর দ্বিজেন্দ্রলালই বলুন—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে রবীন্দ্রকাব্যের অসাধারণ ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। দেশে একটা নূতন কাব্যের জোয়ার জেগে উঠতে দেখে তাঁরা তারই বিরুদ্ধে বাঁধ বাঁধতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় তাঁরা সফলকাম হন নি। 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকার প্রথম অভিনয়-রজনীর দৃশ্যটি স্মরণ করুন।—কিন্তু আমরা, যারা আধুনিক বাংলা কাব্যের বিরোধিতা করি—তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আমরা দেখছি, এ কাব্য কেউ পড়ে না। এই অপূর্ব কাব্য-সূক্তাবলীর অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশীয়), উদ্গাতা ঋষি আছেন, সুপণ্ডিত ভাষ্যকার আছেন—নেই কেবল পাঠক। শুধু তাই নয়, এর ফলে আরও গুরুতর একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই কাব্যের প্রাদুর্ভাবের ফলে বাঙালী পাঠক-সমাজের মন সামগ্রিক ভাবে কাব্যবিমুখ হয়ে উঠছে। আজকাল যদি সত্যকার ভাল কবিতাও কেউ লেখেন, পাঠকেরা তাও পড়তে চাইবে না। বাংলা কবিতার নদীতে আজ ভাঁটার টান প্রখর হয়ে উঠেছে—পাঁকের গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমরা চাই—বিগত যুগের রসপ্লাবনের জোয়ার আবার ফিরে আসুক, বাংলা কবিতা আবার আগের মত রসিক পাঠকের হৃদয়ের বস্তু হোক, তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাক। আধুনিক কবি সম্প্রদায় তা কিছুতেই হতে দিচ্ছেন না। আমাদের নালিশ সেইখানে।

॥ দশ ॥

খ্যাতনামা ইংরেজ কবি ও সমালোচক সেসিল ডে লুইস্ সেদিন একটা বড় মর্মান্তিক সত্য কথা বলে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'সাম্প্রতিক কালে ইংলণ্ডে কবিতা একটা অপ্রধান শিল্পে (minor art) পরিণত হয়েছে।'

কথাটা নিয়ে কোন রকম আলোচনা করার আগে ডে লুইস্ সম্বন্ধে পাঠকদের ছুটো কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। প্রথমত, ইংলণ্ডে 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনের স্রষ্টা ও পুরোধা বলে যাঁরা পরিগণিত হয়ে থাকেন ইনি তাঁদের অন্যতম। কাজেই এঁর মুখের কথাকে প্রাচীন-পন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচনা বলে অভিহিত করবার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, এখন থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে ডে লুইস্ 'এ হোপ ফর পোয়েট্রি' নাম দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'আধুনিক' কাব্যের অভ্যুদয়ের ফলে তৎকালে যে সব 'অনাধুনিক' পাঠক ও সমালোচক ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, প্রধানত তাঁদের আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যেই এই অতি সুলিখিত ও পরম সুখপাঠ্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। কাজেই মন্তব্যটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈরাশ্যবাদ-প্রসূত এমন কথা বলবারও উপায় নেই।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে 'আধুনিক' ইংরেজী কবিতার প্রগতি ও বিবর্তন লক্ষ্য করার পর একজন 'আধুনিক' ইংরেজ কবি কেন আজ এমন একটা মন্তব্য করে বসলেন তা বুঝতে হলে 'অপ্রধান শিল্প' কাকে বলে এবং প্রধান শিল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য কি তা ভাল করে প্রণিধান করা প্রয়োজন।

প্রধান শিল্প বলতে আমরা বুঝি সেই জাতীয় শিল্পকে, যার নিজস্ব রম্যতাগুণের প্রভাবে জনগণের মন স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়

এবং যার অন্তর্নিহিত রসবস্তুর সৌন্দর্য, গভীরতা, ব্যাপকতা ও প্রাণচাঞ্চল্য সহৃদয় উপভোক্তার মনে আনন্দ ও আবেগের সঞ্চার করে। কোনরূপ প্রধান শিল্পের রসোপভোগের নিমিত্ত দেহমনের সুস্থতা, স্বাভাবিক মননশক্তি ও সংবেদনশীলতা, মোটামুটি ধরনের বিদ্যাবুদ্ধি এবং সামান্য একটু কল্পনাশক্তি ব্যতীত আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। [অবশ্য পূর্ণ ও প্রবুদ্ধ উপভোগের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, কিন্তু সে সাধনার পদ্ধতিও সাধারণ শিল্পরসিকদের অনায়ত্ত নয়।]

চসার থেকে আরম্ভ করে ইয়েট্‌স পর্যন্ত ইংরেজী কবিতার যে ধারা প্রচলিত ছিল তা যে একটা প্রধান শিল্পধারা সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অপ্রধান শিল্পের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এই :

(১) এই জাতীয় শিল্পের নিজস্ব কোন রম্যতাগুণ থাকে না।

(২) এ শিল্প জনগণের মনকে আকর্ষণ বা স্পর্শ করতে পারে না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে চায় না। এ শিল্প নিতান্তই গোষ্ঠীগতপ্রাণ—গোষ্ঠীর আনন্দ-বিধানের জন্যে গোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে।

(৩) অপ্রধান শিল্পের রসোপভোগের জন্যে সর্ব ক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন ; এবং এই শিক্ষা ও সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য উক্ত শিল্পের রসোপভোগ – জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের পক্ষে এই শিক্ষা ও সাধনা নিতান্তই অবান্তর।

(৪) নিজস্ব গোষ্ঠীগণ্ডির বাইরে কেউই এই জাতীয় শিল্পের গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না ; বরং এর তুচ্ছতাই প্রায় সর্ববাদীসম্মত।

(৫) এই জাতীয় শিল্পের স্রষ্টা ও উপভোক্তা সকলেই নিজেদের অসাধারণ বলে মনে করেন। [গোষ্ঠীর বহির্ভূত ব্যক্তিরা সকলেই এঁদের পাগল—অন্ততপক্ষে রসক্ষ্যাপা বলে মনে করে।]

(৬) এই জাতীয় শিল্পরসিকেরা শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তু, অথবা জীবন-বিরোধী বস্তু, অথবা জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু বলে ভেবে থাকেন। শিল্পের মনগড়া আইনের খাতিরে এঁরা জীবনের আইনকে অগ্রাহ্য করতে ইতস্তত করেন না।

(৭) শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ সুস্থতা এবং এই জাতীয় শিল্পচর্চা প্রায় পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার।

আরও অনেক কিছুর উল্লেখ করা যেত, কিন্তু আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নৃত্যশিল্প একটা প্রধান শিল্প। কিন্তু কোন নৃত্যশিল্পী যদি মাথার উপর পর পর কতকগুলো ঘড়া সাজিয়ে নৃত্য করাকেই শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন, তবে তাঁর সেই শিল্পকলাকে অধিকাংশ নৃত্যরসিকই প্রধান শিল্পের মর্যাদা দিতে রাজী হবেন না। তথাপি এই অপরূপ ঘড়ানৃত্যের কিছুসংখ্যক সমঝদার অবশ্যই জুটবে; এবং তার পর কয়েকজন সমালোচকেরও উদ্ভব হবে—যাঁরা ঘড়ার সংখ্যা, ঘড়ার ভিতরকার জলের ওজন এবং নৃত্যশিল্পীর ভারসাম্যবোধের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দেবেন যে এই ঘড়ানৃত্যের তুলনায় অন্য সর্ববিধ নৃত্যকলাই তাৎপর্যহীন, অবজ্ঞেয় ও অনাধুনিক বস্তু। এঁদের কাছে যদি আনা পাভ্‌লোভা অথবা উদয়শঙ্করের নামোল্লেখ করা যায় তাহলে এঁরা প্রথমেই প্রশ্ন করবেন উক্ত দু জন নৃত্যশিল্পী কটা করে ঘড়া মাথায় নিয়ে নাচতে পারতেন। ঘড়া-সংস্পর্শশূন্য নাচের কথা শুনলে এঁরা শুধু মুখ বেঁকিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন।

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কাব্যে নরনারীর যৌন সম্মেলনের রোমাঞ্চক মহিমা নেই; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অতলস্পর্শী অনৈতিকতা নেই; কীট্‌স্ জীবনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না; সুতরাং আধুনিক কবিদের তুলনায় তাঁরা সকলেই নিকৃষ্ট

শ্রেণীর কবি—এ ধরনের সমালোচনার সঙ্গে আমরা আজকাল খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছি।

এই প্রসঙ্গে একটা উদ্ভট শ্লোক মনে পড়ল—

কস্ত্বং লোহিতলোচনাস্যচরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ।
নানারত্ননিবদ্ধবেদিবলয়াস্তীরেষু ভূমিরুহাঃ
শম্বুকাঃ কিমু সন্তি নেতি হি বকৈরাকর্ণ্য হীহীকৃতম্॥

—মানসসরোবর-প্রত্যাগত একটি হংসের কাছে বকেরা জানতে চাইল সেখানে কি আছে। শুনল, সেখানে সুবর্ণপঙ্কজবন আছে, ক্ষীরের ন্যায় সুস্বাদু জল আছে, তীরদেশে নানারত্নখচিত্ বেদী-সমন্বিত বৃক্ষের শ্রেণী আছে। কিন্তু সেখানে শামুক নেই শুনে বকের দল হি হি করে উপহাসের হাসি হেসে উঠল।

এই বকের দল শামুকরূপী অপ্রধান শিল্পের সেবক ; শামুক-শিল্পের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন শিল্পের অস্তিত্ব তারা কল্পনাও করতে পারে না।

ইংলণ্ডের কাব্যজগতে আজকাল এই বকেদের প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে বেশি। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর ধরে সেখানে যে কাব্যনির্ঝরিণী সর্বসাধারণকে 'পীযূষতুল্যং পয়ঃ' পরিবেশন করে এসেছে, আজ তা পল্বলে পরিণত হয়েছে—এবং তাতে চুটিয়ে শুধু শামুকেরই চাষ চলছে। গণকাব্য আজ গোষ্ঠীকাব্যে পরিণত হয়েছে। এতবড় একটা পরিবর্তন মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের অনেকের চোখের সামনে সাধিত হয়ে গেল! অনেক ইতিহাসখ্যাত রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে এ বিপ্লবের গুরুত্ব কম নয়।

একদিকে টেক্‌নলজিসর্বস্ব নব-বর্বরতার অভ্যুত্থান, অন্যদিকে এই গোষ্ঠীকাব্যের সমঝদারদের ঢক্কানিনাদ—দুইএর চাপে পড়ে ইংলণ্ডের কাব্যলক্ষ্মী দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তে বসেছেন। ইংলণ্ডের জনগণ আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাব্যবিমুখ হয়ে পড়েছে। যে ইংলণ্ডে একদিন

দরিদ্র খনি-শ্রমিকের কুটীরেও পোপ অথবা শেলী অথবা টেনিসনের কাব্যগ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য ছিল না, সেখানে আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে যাঁরা কবিতা লেখেন শুধু তাঁরাই কবিতা পড়েন—গোষ্ঠীর বাইরের লোকেরা আধুনিক কবিতার নাম শুনলে হাসে।

কেন হাসে তা বুঝতে হলে যে কোন একখানা আধুনিক ইংরেজী কাব্যসঙ্কলনগ্রন্থের যে-কোন পাতা খুলুন, তার পর পড়ুন—

Mildness amid the neo-Nietzschean clatter,
His sense of graduations,
Quite out of place amid
Resistance to current exacerbations……

অথবা, My father moved through dooms of love
through sames of am through haves of give,
singing each morning out of each night
my father moved through depths of height···

অথবা,
The strict simple
principles of
straight branches
are being modified
by pinched out
ifs of colour, devout
conditions
the smiles of love·········

এমন কবিতাকে অপ্রধান শিল্প ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? 'এ হোপ ফর পোয়েট্রি'-র লেখক যদি ত্রিশ বৎসর কাব্যচর্চার পর

আজ ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠে থাকেন তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

... ...

প্রথমে স্থির করেছিলাম এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েও কিছু আলোচনা করব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম তার কোন প্রয়োজন নেই। একটি মাত্র ব্যাঙ্কের ওপর চেক কেটেই আমাদের দেশের আধুনিক কবিরা তাঁদের আধুনিকত্ব এবং কবিখ্যাতি দুইই খরিদ করে আসছেন। সেই ব্যাঙ্ক আজ লালবাতি জ্বেলেছে। এখন তাঁদের পুঁজিপাটার অসারতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুধু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-ই মারা হবে।

॥ এগারো ॥

রবীন্দ্র-সাহিত্য রূপ মহাসমুদ্রের ক্ষুদ্রতম অংশও জরিপ করবার স্পর্ধা রাখি না—সে সামর্থ্য আমার নেই। যাঁদের আছে তাঁরা ভাগ্যবান। শতবার্ষিকীর সহস্র আসর তাঁরাই জমজমাট করে রেখেছেন।

আমার কারবার সাময়িক তথা সমসাময়িক সাহিত্য নিয়ে। কিন্তু এই মহারণ্যেও দেশব্যাপী স্মরণোৎসবের দমকা হাওয়া এসে প্রবেশ করেছে, প্রবীণ মহীরুহরাজি থেকে আগাছার জঙ্গল পর্যন্ত সবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাজেই আমার মত অনধিকারীর মগজেও কিছু চিন্তা, কিছু দুশ্চিন্তা গজিয়ে উঠেছে। প্রায় বাধ্য হয়েই দুই একটা কথা বলতে হচ্ছে।

কাব্য সাহিত্যের কথাই ধরা যাক।

প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে আমি একবার পুরী যাই। সমুদ্রের ধারে যে বাড়িতে আমরা থাকতাম তার পিছনেই ছিল নুলিয়াপাড়া। এই পাড়ায় মাঝে মাঝে আমি বেড়াতে যেতাম, নুলিয়াদের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ-আলোচনা করবার চেষ্টা করতাম। এই পাড়ার একটা ব্যাপার দেখে তখন খুবই বিস্ময় অনুভব করেছিলাম মনে আছে। নুলিয়াদের বাসগৃহগুলি সবই ছিল সমুদ্রের দিকে পিছন-ফিরানো। সমুদ্রের হাওয়া ঢুকতে পারে এমন একটা ছোট জানালাও পিছনের দেয়ালে তারা রাখত না। প্রশ্ন করে জবাব পেয়েছিলাম, ও হাওয়া বেশি গায়ে লাগালে নাকি জ্বর হয়!—যে সমুদ্রের হাওয়ার লোভে বেলাভূমিতে হাজার হাজার বিদেশীর ভিড়, উপকূলের খাস বাসিন্দারা তারই বিরুদ্ধে দেয়াল গেঁথে পিছন ফিরে আত্মরক্ষা করছে।

আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের আধুনিক কবিকুলের মনোভাব ও অবস্থা এই নুলিয়াদেরই মত। রবীন্দ্রকাব্য-সমুদ্রের তীরেই এঁরা

বাস করেন, কিন্তু পাছে সেই সমুদ্রের অপরূপ লহরীলীলায় চক্ষু মুগ্ধ হয়, পাছে তার উদাত্ত নির্ঘোষ কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পৌঁছয়, পাছে তার সর্বসন্তাপহারী সমীরণপ্রবাহ গায়ে এসে লাগে, তাই চোখকান বন্ধ করে পিছন ফিরে গুটিশুটি মেরে বালির দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে আছেন। কি—না রবীন্দ্রপ্রভাবকে প্রতিরোধ করতে হবে, নইলে নাকি আধুনিক বাঙ্লা কাব্যের মুক্তি নেই!

দেশেরই দুর্ভাগ্য। নইলে এমন দুর্বুদ্ধি এঁদের হতে গেল কেন? কেন এঁরা একবারও ভেবে দেখলেন না যে বাংলার মত কাব্যপাগল দেশে—যেখানে একদিন বটতলায় ছাপা রামায়ণ-মহাভারত ও মহাজন-পদাবলী প্রতি গৃহে পাওয়া যেত, এবং আজও যেখানে পঁচাত্তর টাকা খরচ করে রবীন্দ্ররচনাবলী কিনবার লোক অন্তত এক লক্ষ আছে (সবাই সময় মত টাকা জমা দিয়ে দরখাস্ত করবার সুযোগ করে উঠতে পারে নি)—সেখানে তাঁদের লেখা কাব্য কেন এমন অনাদৃত? রবীন্দ্র-প্রভাবকে প্রতিরোধ তাঁরা অবশ্যই করেছেন, কিন্তু তার ফলে কি কাব্যবস্তু তাঁরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন? আধুনিক তাঁরা সবাই, কিন্তু সত্যকার কবি তাঁদের মধ্যে ক-জন আছেন?—এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার তাঁদের কিংবা তাঁদের হাতধরা সমালোচকদের নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দিতে পারে বাংলাদেশের কাব্য-পাঠকেরা, এবং তারা সে উত্তর দিয়েছে।

তাই আজ রবীন্দ্রনাথের লক্ষ লক্ষ অনুরাগী ভক্ত পাঠকের কাছে এ উৎসব শুধু স্মরণোৎসব নয়, বিজয়োৎসবও বটে। রবীন্দ্রনাথ আজ বিজয়ী। দেশবাসীর মুক্তচিত্তের অঙ্গনে আজ তাঁর নামে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

কিন্তু তবু ভুললে চলবে না যে বাংলাদেশের আধুনিক ও সাম্প্রতিক কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আজ বিজয়ী নন, তিনি পরাভূত।

কাব্য বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝতেন, এঁরা তা বোঝেন না—কাব্যের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা ছিল, এঁদের ধারণা তার বিপরীত। এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবকে প্রতিরোধ করবার জন্যে এঁরা কাব্যের সংজ্ঞাই পালটে দিতে চান।

ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রতিরোধের স্বরূপটি আমাদের ভাল করে বুঝে রাখা প্রয়োজন। এর মূলে আছে কতকগুলি পরস্পর-পিঠ-চুলকানো সমিতি—যার সদস্যেরা সবাই কবি। একজন অপরজনের কাব্যের প্রশংসা করে প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রতিদানে অনুরূপ প্রশস্তি প্রত্যাশা করেন। কয়েকজন পোষ-মানা সমালোচক এবং পৃষ্ঠপোষক সম্পাদক এই পারস্পরিক ঢাক বাজানোর কাজে সহায়তা করেন। এমনি করেই এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাবকে প্রতিরোধ করেছেন, নূতন কাব্যের প্রবর্তন করেছেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। "লোকে পড়ে কি না পড়ে জানেন বিধাতা, খ্যাতি চিরকাল রবে।" আধুনিক বাংলা কাব্যের মত এমন সম্পূর্ণভাবে পাঠক-নিরপেক্ষ সাহিত্য ভূভারতে আর নেই।

আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো গত বছর দুয়েকের সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি সংগ্রহ করুন এবং তাতে আধুনিক কালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থের যতগুলি সমালোচনা বেরিয়েছে তা থেকে দুটি ফর্দ তৈরি করুন—একটি কবিদের নামের, অপরটি সমালোচকদের নামের। এইবার ফর্দ দুটি মিলিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন, এ-ফর্দে যাঁদের নাম, ও-ফর্দেও ঠিক তাঁদেরই নাম রয়েছে।

পরাভূত রবীন্দ্রনাথ!

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ফিকে পান্‌সে দুর্বল, অকারণ উচ্ছ্বাসে বোঝাই। তাতে প্যাশন নেই, অবচেতন অনুভূতির অতলান্ত গভীরতা নেই, মননের গাঢ়বদ্ধতা নেই। মানসিকতার দিক দিয়ে তা একান্ত-ভাবে বুর্জোয়া, বিশ্বাসের দিক দিয়ে তা ধর্মীয় কুসংস্কারের বাহন। তাঁর

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যুগও ফুরিয়ে গেছে, নূতন যুগের নূতন কাব্য তাঁকে অগ্রাহ্য করেই গড়ে উঠেছে—তিনি যুগের সৃষ্টি, যুগস্রষ্টা নন।

এই হল রবীন্দ্র-প্রতিরোধ অভিযানের ম্যানিফেস্টো। এর একটা কথাও আমার বানানো নয়, যাঁরা সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এর প্রতিটি উক্তির উদ্গাতাকে একটু চেষ্টা করলেই চিনতে পারবেন।

এই অভিযানের পিছনে একটা মনস্তাত্ত্বিক 'রহস্য আছে। সেটা বুঝতে হলে অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যেতে হবে। আধুনিক বাংলা কবিকুলের যাঁরা গুরুস্থানীয় তাঁরা তখন তরুণ। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী কবিতা লিখে তাঁরা তখন যেটুকু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁদের সাধ মেটে নি। তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না, কিন্তু "পথ রুধি বসে আছে রবীন্দ্র ঠাকুর।" তাই তাঁরা shock tactics অবলম্বন করলেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এমন আহামরি কিছু নয় তাই প্রমাণ করবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। পরোক্ষ বক্তব্য ছিল যে কবি হিসাবে তাঁরাও বড় কম যান না, তা রবীন্দ্রভক্তেরা যাই বলুন না কেন। কিছু অখ্যাতি তাঁরা এর ফলে অর্জন করেছিলেন এবং সেটাকে লাভ বলেই ধরে নিয়েছিলেন। সুখ্যাতি এবং অখ্যাতি দুইই খ্যাতির রূপান্তর মাত্র, আত্মপ্রচারের ক্ষেত্রে দুইই সমান মূল্যবান।

এর পর আরম্ভ হল আত্মসম্মোহনের পালা, অর্থাৎ এঁরা সত্যসত্যই বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে কবি হিসাবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের তো বটেনই, কোন কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতরও বটেন। হতভাগ্য দেশের পাঠকেরাই শুধু তাঁদের চিনল না। এই ভাবে কাব্যে আধুনিকতা নামধেয় বিচিত্র বস্তুটির পত্তন হল। যা ছিল tactics তা policyতে পরিণত হল—রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযান শুরু হয়ে গেল।

এঁদেরই চেলাচামুণ্ডারা আজ বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আধিপত্য

বিস্তার করেছে। যে সব প্রবীণ আধুনিকদের কথা এইমাত্র বললাম তাঁরা কেউই পুরোপুরি অকবি ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা মন্ত্র পড়ে যে সব ভূত নাচিয়ে তুলেছেন তারা শুধু আধুনিকতার নেশাতেই উন্মাদ, কাব্য অপকাব্য ও অকাব্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝবার সামর্থ্যও তাদের নেই। তাই আজ বিদ্রোহের মিছিল পাগলের পাগলামিতে পর্যবসিত হয়েছে, এবং এই স্বদেশী পাগলামিতে অপ্রত্যাশিত ইন্ধন জুগিয়েছে সাগরপার থেকে আমদানি করা বিদেশী পাগলামি।

কিন্তু there is method in this madness. একটা ক্ষেত্রে এঁরা সবাই একমত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য খুব উঁচুদরের কাব্য নয়, বিশেষ করে এ যুগে ও কাব্য একেবারেই অচল। আধুনিকতার অর্থ-ই হল রবীন্দ্র-বিরোধিতা (এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগে থিসিস্ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে)। এবং এইটাই সবচেয়ে বড় কথা—এঁরা এবং এঁদের গুরুদেবেরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাব্য লিখে থাকেন।

এই ধরনের বিশ্বাস যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের আমরা বিদ্রূপ করতে পারি, এমন কি পাগল বলে অগ্রাহ্যও করতে পারি, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণে আমাদের প্রত্যেকেরই যা খুশি তাই ভাববার স্বাধীনতা আছে।

কিন্তু যা খুশি তাই করবারও অধিকার আছে কি?

এ প্রশ্ন তুলছি এই কারণে যে রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযানের এই সব নেতা ও উপনেতাদের কেউই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে উদাসীন বা উৎসাহহীন নন। এঁরা সবাই এসে এই উৎসবে সোৎসাহে যোগদান করেছেন, কেউ কেউ বা কোন কোন উৎসব-সমিতির কর্মকর্তাই হয়ে বসেছেন।

এর ফলে আমার মত সরলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বড় ধাঁধাঁয় পড়ে গেছে। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বে যাঁরা বিশ্বাস

করেন না, যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আজ পরাভূত, এই দেশব্যাপী বিজয়োৎসবে তাঁরা এসে যোগ দিয়েছেন কেন ?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সম্ভব।

এঁরা জানেন, জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। এঁরা কবে কি বলেছেন, কবে কি লিখেছেন কেউ তা মনে রাখে নি। সুতরাং সবাই যে হুজুগে মেতেছে, তাতে হুড়িয়ে পড়ে যোগদান করলে তাঁদের লোকসান কিছুই হবে না—বরং কিছু লাভই হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও তাঁদের নিজেদের কাব্য সম্বন্ধে তাঁরা মনে মনে যে ধারণা পোষণ করেন তাতে আঁচড়টিও লাগবে না, অথচ মাঝখান থেকে তাঁরা বেশ খানিকটা ফালতু জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিতে পারবেন। (এই জনপ্রিয়তা বস্তুটির প্রতি এঁদের অমানুষিক লোভ, কারণ এটি এঁরা কোনদিনই করায়ত্ত করতে পারেন নি। বাহ্যিক অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের আড়াল থেকে এই লোভ বারবার উঁকি মেরে আত্মপ্রকাশ করেছে।)

অর্থাৎ—আত্মপ্রচার! চালাকি, মতলববাজি এবং সুচতুর কাপট্যের সাহায্যে আত্মপ্রচার।

"নিজেরে না যেন করি প্রচার—!"

হায় রবীন্দ্রনাথ!

বাংলাদেশে সব উৎসবই হুজুগে পরিণত হয়। রবীন্দ্রমহোৎসবও একটা বিরাট হুজুগের রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু তাতে দোষ কি ? বাঙালী হুজুগ ভালোবাসে, বাঙালী রবীন্দ্রনাথকেও ভালোবাসে। আজ তার দুটি ভালোবাসার বস্তু এক হয়ে গেছে। তাই আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত সভাসমিতি, এত শোভাযাত্রা, এত প্রদর্শনী, এত সঙ্গীতানুষ্ঠান, এত নাট্যোৎসব, এত নৃত্যোৎসব। এই দেশব্যাপী হুজুগ শুধু এই কথাই প্রমাণ করছে যে রবীন্দ্রনাথ আজ বাঙালী জাতির অস্থি মজ্জা রক্তধারার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন, তাঁর

কথা ভুলে গিয়ে জাতি হিসাবে বাঙালী আজ নিজের অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারে না।

তা ছাড়া, আমরা এবং আপনারাই তো এই হুজুগের স্রষ্টা। তবে আর দোষ দেব কাকে? দোষ দেবই বা কেন?

তবে কি জানেন? হুজুগের বাজারে পাঁচমিশেলী লোকের ভিড় তো কিছু হবেই। রেলস্টেশনের ভিড়ের মধ্যে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয় আপনাদের নজরে পড়েছে ঃ"—নিকটেই আছে।" দুধের পুকুরে দুই এক ঘটি জল ঢালবার লোক সব সময়েই নিকটে থাকে।

তাই শুধু একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে মই হিসাবে ব্যবহার করে যাঁরা আত্মপ্রচারের পাকা ফলটি পেড়ে খাবার মতলবে আছেন, সুযোগ পেলেই তাঁদের পায়ের তলা থেকে মইটি কেড়ে নিতে হবে।

তাঁদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কিছুই এ মহোৎসবের মহিমা ম্লান করতে পারবে না সত্য, কিন্তু কাপট্যের প্রশ্রয় দিলে আমরা নিজেদের কাছে নিজেরাই অপরাধী হব।

॥ বারো ॥

আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের রাজ্যে একটা বড় রকমের সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হয়। বাংলা ছোটগল্পের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেছে—এইবার বোধ হয় তার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের তরুণতম লেখক পর্যন্ত অনেকেই এমন বহু ছোট গল্প রচনা করেছেন যা নিয়ে সত্যিই আমরা গৌরব করতে পারি—বিশ্বসাহিত্যের বাজারেও যা নেহাত অল্প মূল্যে বিকোবার জিনিস নয়। বস্তুত, বিদেশী সাহিত্যের কোন কোন তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন' পড়তে পড়তে আমার মত আরও অনেকের অনেক সময়েই মনে হয়েছে, 'তেমন আহামরি বস্তু তো এর মধ্যে কিছুই পেলাম না! এর যে-কোন গল্পের চেয়ে আমাদের অমুক কিংবা অমুক কিংবা অমুকের গল্প অনেক ভাল হয়ে থাকে।'—অবশ্য স্বদেশী ঠাকুরের চেয়ে বিদেশী কুকুর যাঁদের কাছে অনেক বেশি শ্রদ্ধার পাত্র তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

বাংলাদেশের লেখকেরা ভাল ছোটগল্প লিখতে পারেন—এ কথার অন্তত প্রতিবাদ কোন তরফ থেকে ওঠবার সম্ভাবনা নেই বলেই বিশ্বাস। কিন্তু লেখক তো শুধু লিখেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না—তিনি লেখা ছাপতে চান এবং সম্ভব হলে তা থেকে কিছু রোজগার করতেও চান। অর্থাৎ বাজারে তাঁর লেখার একটা চাহিদা থাকা প্রয়োজন, নইলে লেখা ছেপে প্রকাশ করবার সুযোগ তিনি পাবেন কি করে?

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই চাহিদা বহুলাংশে কমে এসেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আদৌ আর কোন চাহিদা থাকবে না।

চাহিদা কমতে শুরু করেছে অনেক দিন থেকে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই। বইএর দোকানে বসে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন,

খদ্দের এসে 'টানা গল্পে'র বই, অর্থাৎ উপন্যাস চাইছে—ছোটগল্পের বইএর পাতা উলটেই এক পাশে ঠেলে রাখছে। সাহিত্যের বাজারে আজকাল সত্যিকারের চাহিদা একমাত্র উপন্যাসেরই আছে, এবং সে উপন্যাস যত বড় হয় ততই ভাল—মূল্য তার দশ বিশ পঁচিশ যাই হোক না কেন। যে-সব লেখকের উপন্যাসের হু-হু করে সংস্করণের পর সংস্করণ কেটে যাচ্ছে, তাঁদের লেখা গল্পের বইও দপ্তরির ঘরে গুদামে পড়ে পচছে।

যে বই পাঠকেরা পড়তে চায় না, খদ্দেররা কিনতে চায় না, প্রকাশকেরাই বা তা ছাপতে চাইবেন কেন? তাঁরা তো সদাব্রত খুলে বসেন নি—তাঁরা ব্যবসায়ীঃ জেনেশুনে লোকসানের পথে তাঁরা পা বাড়াতে যাবেন কেন? তাঁদের দোষ দেওয়া বৃথা।

যে দেশে এত ভাল ছোটগল্প লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে সে দেশের পাঠকেরা আর ছোটগল্প পড়তে চায় না। এমন একটা রহস্যময় পরিস্থিতির কারণ কি?

আমার একজন cynic বন্ধু এর একটা কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, ছোটগল্পের একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট রস আছে। ছোটগল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার নয়, বড় গল্পের ছোট সংস্করণও নয়। তার শিল্পরূপের এবং রসের এই বৈশিষ্ট্যটুকু শুধু সেই সব পাঠকই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন যাঁরা শিক্ষিত মন, ক্ষিপ্র বুদ্ধি এবং মার্জিত রুচির অধিকারী। বন্ধুর মতে, এই শ্রেণীর মানুষ বাংলাদেশে এখনও যে কয়জন অবশিষ্ট আছেন তাঁদের পেশা এঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারি, এবং নেশা নিজ নিজ জীবনের মানোন্নয়ন। অবসর পেলে এঁরা মাঝে মাঝে দুই-একখানা ইংরেজী গোয়েন্দাকাহিনী বা গুপ্তচরকাহিনী পড়ে থাকেন—সাহিত্য-ফাহিত্যের কোন ধার ধারেন না। আজকাল যাঁরা বাংলা সাহিত্য পড়ে থাকেন তাঁরা অধিকাংশই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত, স্থূলবুদ্ধি ও আলস্যপরায়ণ। এঁদের প্রচুর অবসর আছে, অথচ মনের

বা কল্পনার নিজস্ব পুঁজি কিছুই নেই। মনের ফাঁক ভরাট করার জন্যেই এঁরা যে-কোন একটা দীর্ঘায়িত কাল্পনিক কাহিনীকে অবলম্বন করে সময় কাটাতে চান। সুতরাং উপন্যাস চাই—ভাল মন্দ যেমন হোক না কেন ক্ষতি নেই, শুধু বড় হওয়া চাই ; চট্ করে যেন ফুরিয়ে না যায়। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের পাঠক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠিকা) ছোটগল্প পড়ে কোন আনন্দই পেতে পারেন না।

কারণ যাই হোক না কেন, পরিস্থিতিটা সত্যই শোচনীয়। বাংলা ছোটগল্পের বইএর প্রকাশক পাওয়া আজকাল অত্যন্ত দুরূহ—প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল নাম-করা ঔপন্যাসিকদের লেখা ছোটগল্পের বই। বড় উপন্যাস পাবার আশায় প্রকাশকদের এ সব বই ছাপতে হয়—তা বিক্রি হোক বা না হোক, এবং ঔপন্যাসিকের লেখা ছোটগল্পের বিশেষ কোন শিল্পমূল্য থাকুক বা না থাকুক।

তবু এতদিন ছোটগল্প-লিখিয়েদের সামনে একটা দরজা খোলা ছিল —নিজেদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবার একটা সুযোগ তাঁরা পেতেন। বহুদিন ধরে রেওয়াজ চলে আসছিল, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা করে ছোটগল্প ছাপাতে হয়। এর জন্যে কোন কোন পত্র-পত্রিকা লেখকদের কিছু কিছু দক্ষিণা দিতেন, এবং এই সব লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে দুই একটা সত্যিকারের ভাল গল্পেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেত।

কিন্তু এই দরজাটাও বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা জানতে পেরেছেন, পাঠকেরা ছোটগল্প পড়তে চায় না, তারা চায় উপন্যাস—আরও বেশি উপন্যাস, আরও বড় উপন্যাস। সুতরাং তাঁরা প্রতি সংখ্যায় কয়েকটা করে ছোটগল্প না ছেপে তার বদলে একটা করে 'এক সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস' ছাপতে শুরু করে দিয়েছেন।—এর ফলে তাঁদের পত্র-পত্রিকার কাটতি নিশ্চয় বাড়বে, কিন্তু শিল্প হিসাবে বাংলা ছোটগল্পের সর্বনাশ হয়ে গেল।

ছোটগল্প আর ছাপা হবে না—কাজেই আর লেখাও হবে না।

কলা-কৈবল্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষে কেউ শিল্পসাধনা করতে পারে না।

জানি না কোন্ সম্পাদকের মগজে এই brain-waveটি প্রথম উদিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি শুধু বাংলা ছোটগল্পেরই মূলোচ্ছেদের কৃতিত্ব অর্জন করে গেলেন না, বাংলা উপন্যাসশিল্পেরও বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন।

॥ তেরো ॥

আজকাল একটা নূতন হুজুগ দেখা দিয়েছে—মাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একখানা করে 'সম্পূর্ণ' উপন্যাস ছাপতে হবে। পাঠক-পাঠিকারা নাকি ছোটগল্প পছন্দ করেন না, তাঁরা চান উপন্যাস—'টানা গল্প'। সুতরাং এখন সাময়িক সাহিত্যের বাজারে উপন্যাসের মরশুম শুরু হয়েছে—পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ 'উপন্যাস'। ছোট-বড়, নবীন-প্রবীণ, উঠতি-পড়তি—বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর লেখকেরা এখন প্রায় প্রতি সপ্তাহে একখানা করে উপন্যাস লিখে ফেলছেন: হুজুগের বাজার গরম থাকতে থাকতে দু পয়সা কামিয়ে নিতে হবে।

পূর্বে একবার ব্যাপারটার উল্লেখ করেছি এবং সেই প্রসঙ্গে বাংলা ছোট গল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার এই হুজুগের ফসল সম্বন্ধে, অর্থাৎ এই অভিনব উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলবার চেষ্টা করব।

প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে পাঁচ-সাতখানা করে এই জাতীয় উপন্যাস নানা মাসিকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। সাধারণ ভাবে ছাপলে এর কোনখানা দিয়েই পঁচিশ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার (ডবল ডিমাই, স্মল পাইকা) বেশি ভরানো সম্ভব নয়। অসাধারণ ভাবে ছাপলেও—অর্থাৎ পাইকা হরপে এবং প্রত্যেকটি বাক্যকে আলাদা প্যারাগ্রাফ হিসাবে সাজিয়ে ছাপলেও—টেনেটুনে বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় পরিণত করা যেতে পারে।

কিন্তু পঁয়ত্রিশই হোক কিংবা পঁয়ষট্টিই হোক—উপন্যাসগ্রন্থের পক্ষে, 'টানা গল্পের বই'-এর পক্ষে, তা নিতান্তই অযথেষ্ট। সুতরাং বাধ্য হয়ে লেখককে নানা রকম গোপন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। প্রক্রিয়াগুলিকে ছলচাতুরীও বলা যেতে পারে।

এক নম্বর প্রক্রিয়া হল একই কেন্দ্রচরিত্রকে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর নায়ক অথবা অন্তত পক্ষে কথক হিসাবে অবতীর্ণ করানো এবং পরে ঐ কাহিনীগুলি একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই বস্তুকে 'টানা গল্প' বা উপন্যাস বলে চালিয়ে দেওয়া। এইটিই সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া। কিন্তু এটা একটা 'কামুফ্লাজ' বা ছদ্মবেশ মাত্র। কিছুদূর পড়বার পরই পাঠক বুঝতে পারে যে লেখক তাকে ঠকাচ্ছেন। এর ব্যবসায়িক ফল ভাল হয় না। যারা ছোটগল্প পড়তে চায় (অবশ্য সংখ্যায় তারা খুবই কম) তারা এ বই পড়ে না, আর যারা 'টানা গল্প' পড়তে চায় তারা পড়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া হল মূল রচনার মধ্যে স্থানে অস্থানে লম্বা লম্বা বর্ণনা, অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক প্রলাপ, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অবান্তর দার্শনিক বক্তৃতা, নায়ক-নায়িকার চিন্তাধারার অনুবর্তন প্রভৃতি নানা জাতীয় 'প্যাডিং' ভরে দিয়ে কানাকড়িকে সাত কাহনে পরিণত করে তোলা। তা ছাড়া 'ফ্ল্যাশ্ ব্যাক'-এর কুবেরের ভাণ্ডার তো আছেই। পাকা উপন্যাস-লিখিয়েরা সাধারণত এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করে থাকেন। এতে নূতন করে শিল্পচিন্তারও প্রয়োজন হয় না, অথচ বইখানিও বেশ দমে ভারী হয়ে ওঠে।

তৃতীয় প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত কঠিন। প্রথমে মনে মনে একটা সুসম্পূর্ণ উপন্যাসের খসড়া গড়ে তোলা হয়—তার একটা অবিচ্ছিন্ন শিল্পরূপ পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়। তার পর কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ক্রান্তিমুহূর্তগুলির গাঁঠে গাঁঠে পর্ববিভাগ করে এক উপন্যাসকে কতকগুলি খণ্ড উপন্যাসে ভাগ করে ফেলা হয়। তখন সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় এবং পরে আবার একত্র করে গ্রন্থাকারে পরিণত করা চলে। ভিতরকার ফাঁকগুলিকে অবশ্য সুনিপুণ পুনর্লিখনের দ্বারা ভরাট করে দিতে হয়।—এও এক ধরনের 'কামুফ্লাজ', তবে মোটের ওপর এর ফল খুব খারাপ দাঁড়ায় না।

কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ার ফলে যে সাহিত্যবস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে উপন্যাস-শিল্পের নিরিখে কষে দেখলে তার মূল্য কি দাঁড়ায় ?

এই জাতীয় সমস্ত উপন্যাসই লেখকের দ্বিতীয় চিন্তার সৃষ্টি। অথচ দ্বিতীয় চিন্তা বস্তুটি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-শিল্পীকে এক ধরনের মানসিক অদ্বৈতবাদের উপাসক হতে হয়। তিনি যে সব চরিত্র ও ঘটনাবলী নিয়ে সাক্ষাৎ ভাবে কারবার করেন তাদের চারিপাশে একটা সম্পূর্ণ জগৎ ও জীবনের পরিকল্পনাও তাঁকে করে নিতে হয়। এই জগৎ ও এই জীবন ছাড়া অন্য সব কিছুই সাময়িকভাবে তাঁর কাছে মিথ্যা মায়ায় পরিণত হয়ে যায়। তাঁর মনের রেলগাড়ি মাত্র এই দুটি লাইন ভর করেই এগিয়ে চলতে থাকে—একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। এ লাইনের মাঝখানে কোন স্টেশন নেই। দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ এখানে কোথায় ? যে শিল্পবস্তু একমাত্র মানসিক অখণ্ডতা ও অবিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে তাকে জোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না।' উপন্যাসশিল্প সত্যই একটা মহৎ শিল্প, অথচ এই সব 'এক সংখ্যায় সম্পূর্ণ' উপন্যাসের রচয়িতারা তো দেখছি শিল্পসমুদ্রে সন্তরণের জন্যে একমাত্র চালাকিকেই ভেলা রূপে অবলম্বন করেছেন। জীবননিষ্ঠার পরিবর্তে এঁরা জীবিকানিষ্ঠাকেই পরম বস্তু বলে আঁকড়ে ধরেছেন। বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ ভেবে সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

হুজুগ যতদিন চালু থাকবে ততদিন ঔপন্যাসিকদের কারও সত্যকার উপন্যাস রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ('সাধনার' কথাটা আর নাই বা ব্যবহার করলাম) অবকাশ থাকবে না। সম্পাদকের দাবি—উপন্যাস পত্রিকার এক সংখ্যায় সম্পূর্ণ হবার মত ছোট হওয়া চাই; প্রকাশকের দাবি—উপন্যাস অন্তত পক্ষে তিন টাকা মূল্যে বিকোবার মত বড় হওয়া চাই। একই উপন্যাস

সম্বন্ধে এই দ্বিবিধ দাবির বায়নাক্কা মেটাতেই তাঁদের হাতের সব সময়টুকু ফুরিয়ে যাবে। দুই ব্যবসাদারের দোটানায় পড়ে তাঁরা শুধু কৃত্রিম কলাকৌশল-চর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন, মাঝখান থেকে উপন্যাস-শিল্পের ভরাডুবি হয়ে যাবে।

ছোট গল্পের লেখকেরাই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা যা লিখতে পারেন সে বস্তুর, অর্থাৎ ছোট গল্পের, কোন চাহিদা নেই। অথচ তাঁদের কাছেও তাগাদা আসছে উপন্যাসের জন্যে—পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ উপন্যাসের জন্যে। কাজেই তাঁরা এক রকম বাধ্য হয়েই ছোট গল্পের ব্ল্যাডারের মধ্যে বেশ খানিকটা হাওয়া পাম্প করে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আয়তনে বাড়িয়ে তুলে তাকেই উপন্যাস বলে চালিয়ে দিচ্ছেন; এবং পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বস্তুকে উপন্যাসের মর্যাদাও দেওয়া হচ্ছে হামেশা। লেখকেরাও হয়তো ভাবছেন এইবার তাঁরা সত্য সত্যই বুঝি ঔপন্যাসিক হয়ে গেলেন।

কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা এই ঃ তাঁরা উপন্যাস লিখতে শিখছেন না, ছোট গল্প লেখাও ভুলতে বসেছেন। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য উপন্যাস অথবা ছোট গল্প কিছুই হচ্ছে না—হচ্ছে একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু। এ বস্তুর কোন সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

ছেলে কলেজ থেকে ফিরে বাপকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের বাংলার অধ্যাপক আজ বললেন—'সময় একটা সম্পর্ক। কিছুই বুঝলাম না। তুমি বলে দাও তো, কথাটার মানে কি?'

বিখ্যাত কলেজ, ততোধিক বিখ্যাত অধ্যাপক—সাহিত্যিক, সমালোচক, তার ওপর আবার ডাক্তারি খেতাবও আছে। অন্য লোক হলে হয়তো একটু ঘাবড়ে যেত। কিন্তু বাপ সেকেলে ইংরেজি-নবিস—মনের গড়নটা একটু শ্রদ্ধাহীন ধরনের। খ্যাতির কারণ না জেনে শুধু খ্যাতির আস্ফালনে অভিভূত হয়ে পড়বার পাত্র তিনি নন।

একটু চোখ বুজে ভাবতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনুবাদ!—এবং অনুবাদ-বিভ্রাট!

Time is relative অথবা Time indicates a relation—এই জাতীয় একটা কথা কোন ইংরেজী কেতাবে কোথাও পড়েছেন অধ্যাপক মশাই, এবং স্বকীয় জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তারই একটা অনুবাদ করে ছাত্রদের শুনিয়ে দিয়েছেন।……

একটু হেসে চোখ মেলে ছেলেকে বললেন, 'তোর বাপের ভাগ্যি যে তিনি বলেন নি—সময় একজন কুটুম্ব। তাও তিনি বলতে পারতেন।'

গল্পটা বলবার একটা কারণ আছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, আমাদের সাহিত্যচিন্তার ঘাড়ে অনুবাদের ভূত চেপেছে। আলোচনা-মূলক বা বিতর্কমূলক সাহিত্যের বেলায় কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিজস্ব চিন্তাধারার অনুবর্তন করে নিজস্ব কোন সিদ্ধান্তে পেঁছবার চেষ্টা—যা আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি পুর্বস্থূরীদের মধ্যে—আজকালকার সাহিত্যিকরা বড় একটা করতে চান না। পরকীয়া চিন্তার সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রেমেই এঁদের

আসক্তি বেশি। [শুনেছি, আজকাল নাকি সাহিত্যবিষয়ক এম-এ পরীক্ষাতেও পরীক্ষকেরা নিজস্ব চিন্তার চেয়ে কোটেশন-বাহুল্যের অনেক বেশি কদর দিয়ে থাকেন।]

বিদেশী সাহিত্যে এমন অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে, এমন অনেক মূল্যবান চিন্তা করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের দেশের পাঠক-সমাজে পরিবেশন করবার প্রলোভন হয়তো আমাদের হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে।

প্রথমটি হল আক্ষরিক অনুবাদের পথ—মূল লেখক যে ভাবে যে সব যুক্তি ও রূপকল্পের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, ঠিক সেই ভাবে, অবিকল সেই সব উপায় অবলম্বন করেই তাকে ভাষান্তরিত করতে হবে। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদগুলির ভাষান্তরণের মধ্যেও যথাসাধ্য আক্ষরিকতা বজায় রাখবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।—এ অতি দুরূহ পথ।

প্রত্যেক ভাষার একটা করে নিজস্ব বাচনঘটিত যুক্তিশৃঙ্খলা আছে, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সঙ্গতি সাধনের একটা পন্থা আছে, অলঙ্কার ও অনুষঙ্গ নির্বাচনের জন্যে একটা বিশিষ্ট ভাবজগৎ আছে, এবং দেশের জলমাটি আবহাওয়া ও সমাজসংস্থিতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে—ইংরেজিতে এই সবগুলিকে একসঙ্গে সাধারণভাবে বলা হয় ভাষার genius.

বিদেশী ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করবার অধিকার একমাত্র তাঁদেরই আছে যাঁরা মূলের ভাষা ও অনুবাদের ভাষা দুটি ভাষার genius-ই সমান ভাবে অধিগত করতে পেরেছেন। আমাদের দেশের সাহিত্য-চিন্তনের মধ্যে এ জাতীয় ভাষাজ্ঞান খুব সুলভ নয়।

দ্বিতীয় পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়া উচিত। মূল লেখকের বক্তব্যটিকে সর্বপ্রকার অলঙ্কার ও ভাবানুষঙ্গ-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ ধারণা রূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে পুরোপুরি শুধু নিজের ভাষার genius-এর সাহায্যেই তাকে প্রকাশ করতে হবে।—এও এক ধরনের অনুবাদ।

এর জন্যে বিদেশী ভাষায় খুব সুপণ্ডিত না হলেও চলে, কিন্তু চিন্তার পরিচ্ছন্নতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

ভাষাজ্ঞান ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা দুইএরই যেখানে অভাব সেখানে সময়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু অনুবাদ যে রকমই হোক, তা অনুবাদই—তার কৃতিত্বের প্রায় সবখানিই মূল লেখকের প্রাপ্য। আমাদের দেশে বর্তমানে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অনুবাদ-স্পৃহা খুব কমই নজরে পড়ে—একমাত্র অতি-আধুনিকদের রচনায় ছাড়া। চিন্তামূলক বা আলোচনামূলক বা বিতর্কমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বাঙালী লেখকদের এই দারিদ্র্য আজ অতি প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর কারণ কি? বাঙালীর মস্তিষ্কে কি আজ সত্যই পক্ষাঘাত ধরেছে? বঙ্কিম-ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী কি বাঙালীর কাছে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে?

আমার মনে হয়,—মস্তিষ্কের অবনতি নয়, এর মূলে আছে সেই পুরাতন পাপ—ফ্যাশানের দাসত্ব। ইংরেজ আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে আমরা স্বেচ্ছায় গলায় তুলে নিয়েছি সাংস্কৃতিক পরাধীনতার স্বর্ণশৃঙ্খল—পরম গৌরবে তাই আমরা ঝুম্ ঝুম্ করে বাজিয়ে বেড়াচ্ছি; যেন এই ধার-করা সোনার দৌলতে আমরা সত্যিই খুব একটা কেউ-কেটা বা তালেবর বনে গিয়েছি।

আমাদের তথাকথিত অতি-শিক্ষিত মননশীল সমাজের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুবাদ মাত্র।

পাপ ঐ-খানেই।

॥ পনেরো ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখছিলেন তখন নাকি এক দিন তাঁর কয়েক জন ইংরেজিনবিশ বন্ধুকে বলেছিলেন, 'ওহে, এই ইংরেজী ভাষাটাকে তো কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছি নে—ভারি গোলমেলে ঠেকছে। কি করা যায় বল দেখি?'

বন্ধুরা জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের ইংরেজি শিখতে ছ-মাসও লাগবে না। যদি বাস্তবিকই কোন সন্দেহ হয়, ব্যাকরণ রয়েছে, অভিধান রয়েছে—দেখে নিও। আমাদেরও জিজ্ঞাসা করতে পার।'

প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি হেসে বলেছিলেন, 'সন্দেহ হলে সন্দেহ-নিরসনের উপায় অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার যে কোন সন্দেহই হয় না।'...

গল্পটা সত্য কি মিথ্যা তা জানি না, জানবার প্রয়োজনও বোধ হয় নি। কিন্তু গল্পের অন্তরালে যে তত্ত্বটি আছে সেটি সত্য।—কোন বিষয় উত্তমরূপে অধিগত করতে হলে কিংবা নিজস্ব কোন অভিমত বা সিদ্ধান্ত সর্বজনসমক্ষে উপস্থাপিত করতে হলে একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস যেমন ছাড়তে হয় তেমনি আবার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে, নিজের উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে একটু সন্দেহ অনুভব করাও প্রয়োজন।

কবিরা নাকি নিরঙ্কুশ। কথাটা না হয় মেনেই নিলাম—এমন কি আধুনিক যুগের সমস্ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিককেই না হয় ঐ প্রাচীন 'কবি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকেরাও কি নিরঙ্কুশ? তাঁরা তো রসের কারবারী নন। তাঁদের একমাত্র উপজীব্য হল তথ্য ও তত্ত্ব। তাঁদের মনের মধ্যে সন্দেহের অঙ্কুশ সর্বদাই উদ্যত

হয়ে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বাজারে আমরা এর উল্‌টোটাই দেখতে পাচ্ছি বেশি।

বাংলা দেশে আজ সাহিত্য-সমালোচনার সমুদ্রে কোটালের বান ডেকেছে, আর এই বেনো জলের নুনে ক্ষারে পাঠকসম্প্রদায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে বসেছে। নিত্য নূতন সমালোচনার বই বেরুচ্ছে—দামী দামী মোটা মোটা ভারী ভারী বই। পাতা উল্‌টে দেখুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন শুধু মিথ্যা, অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্যের পসরা। অথচ এই সব বই লিখেই এক দল উদ্ধত আত্মসন্তুষ্ট অতিপ্রগল্‌ভ লেখক সাহিত্যের আসরে অনায়াসে মহাপাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করছেন।

এঁরাও নিরঙ্কুশ। সত্যই এঁদের মনে কখনও কোন প্রকার সংশয় বা সন্দেহের উদয় হয় না। মিথ্যা, অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্যকে এঁরা নির্ভেজাল খাঁটি সত্য বলেই মনে করেন এবং আর কেউ যদি তা মনে করতে রাজী না হয় তা হলে চটে একেবারে কাঁই হয়ে ওঠেন।

কেউ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছেন, কেউ বা বিনা দ্বিধায় Forster-এর গল্প Hawthorne-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বা আবার গ্রীক ভাষার একটি বর্ণও না জেনে গ্রীক দর্শন ও গ্রীক দার্শনিকদের নিয়ে ইয়া বড় গবেষণাপূর্ণ কেতাব লিখে ফেলছেন। সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে যে তথ্যনিষ্ঠার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে তা এঁরা কিছুতেই মানতে রাজী নন—প্রশ্ন তুললে ভারিক্কী চালে নাক উঁচু করে জবাব দেন, ওসব 'তুশ্চু' ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁদের নেই।

অর্থাৎ গভীরতর তত্ত্বকথা নিয়েই তাঁরা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত—তাঁদের মত মহাতাত্ত্বিকদের রচনায় সামান্য তথ্যঘটিত ভুলভ্রান্তি আবিষ্কার করা হীন মক্ষিকাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সুতরাং এঁদের মহামূল্যবান সাহিত্য-তাত্ত্বিক মতামতেরও কিছু নমুনা দেওয়া প্রয়োজন।

একজন ফতোয়া জারি করলেন, বাস্তবানুগতাই উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি (অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র চেয়ে হলধর হালদারের 'হেঁজিপেঁজি' উপন্যাস হিসাবে অনেক বেশি উঁচু দরের জিনিস)। আর এক জন ঘোষণা করলেন, বাংলায় সত্যিকারের ভাল উপন্যাস লিখতে হলে তাতে 'খিস্তির ভাষা' ব্যবহার করতেই হবে। আর এক জন এক কলমের খোঁচায় প্রমাণ করে দিলেন, শেক্স্পীয়রের একটা সনেটেরও সনেট হিসাবে কোন মূল্য নেই। আবার কোন্ এক কেতাবে পড়লাম, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য নাকি তাঁর বৌদি-প্রেমের উৎস থেকেই নিঃসারিত হয়েছে। আরও এক জন ধুরন্ধর সমালোচক অনেক ভেবেচিন্তে 'মাথার চুল হেস্তনেস্ত করে' ফেলে অবশেষে রায় দিলেন, মাইকেল বাংলা ভাষা জানতেন না।

মোদ্দা কথাটা হল এই যে এঁদের কারও মনে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বা বিচারশক্তি সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহের উদয় হয় না।

আরও একটা ব্যাপার সম্বন্ধে এঁদের কোন সন্দেহ নেই। বাংলা-দেশের অধিকাংশ পাঠকই যে হস্তিমূর্খ—যা বোঝানো যায় তাই বোঝে, যে সুর বাজানো যায় তারই তালে নাচতে থাকে—সে সম্বন্ধেও তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

তবু তাঁদের একটি কথা মনে না করিয়ে দিয়ে থাকতে পারছি না: সব মানুষকে কিছু দিনের জন্যে হয়তো ঠকানো যায়, কিছু মানুষকে হয়তো চিরদিনের জন্যেও ঠকানো সম্ভব, কিন্তু সব মানুষকে চিরদিনের জন্যে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব।

॥ ষোল ॥

অনেক দিন আগে আমার পরিচিত একজন তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, সবাই দা ভিঞ্চির "মোনা লিসা" ছবিখানা নিয়ে এত হৈ-চৈ করে কেন? আমি তো ও ছবির মধ্যে তেমন আহামরি কিছু দেখতে পাই না। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রমহিলার চেহারাটা আমার কাছে দস্তুরমত খারাপই লাগে।'

এই অপরূপ শিল্প-সমালোচনা শুনে সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম —আপনারাও হয়তো হাসছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দেশে (এবং বিদেশেও) এক ধরনের সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে, রচনারীতির অপরিসীম গুরুগাম্ভীর্য সত্ত্বেও যার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উক্ত শিল্পবিচারের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এই জাতীয় সাহিত্য-সমালোচনাকে 'সাহিত্যিক বস্তুবিচার' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এ সমালোচনা সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ ও রস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুর বিচার ও বিশ্লেষণ। অর্থাৎ কোন সাহিত্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি এই শ্রেণীর কোন সমালোচকের মনের মত না হয় তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় রায় দিয়ে দেবেন, সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে গ্রন্থখানির কোন মূল্য নেই।

এই সব বস্তুবিচার-মূলক সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি সাধারণত অতি-পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে পরিপূর্ণ, বহুবিচিত্র কোটেশানে কণ্টকিত এবং জটিল দুর্বোধ্য ভাষায় রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে এগুলির বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল : আমি যা পছন্দ করি তুমি তা কর না; আমার মতামতের সঙ্গে তোমার মতামত মেলে না; তোমার ও আমার জীবনাদর্শ এক নয়—সুতরাং তোমার লেখা একখানা বইএরও কোন

সাহিত্যমূল্য নেই, সাহিত্যিক হিসাবে তুমি একেবারে একটা যাচ্ছেতাই অপদার্থ।

সাহিত্য যন্ত্রসঙ্গীতের মত বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র শিল্প নয়। সাহিত্য মিশ্রশিল্প। সুতরাং সাহিত্যে বিষয়বস্তুর কিছু গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তথাপি এ কথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্যবিচার প্রধানত শিল্পবিচার ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না। শিল্পবস্তুর সঙ্গে শিল্পরূপ ও শিল্পরীতির সুসঙ্গত সংমিশ্রণের ফলে—একীকরণের ফলেও বলা চলে—যে সামগ্রিক ফলশ্রুতির উদ্ভব হয়, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা মোটামুটি ভাবে তাকেই 'রস' আখ্যা দিয়ে থাকেন। সর্ববিধ শিল্পের মূল্যায়ন এই রস-বিচারের উপরই নির্ভর করে। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সাহিত্যালোচনার বেলায় কোন ভিন্নতর পন্থা অবলম্বন করলে তা ভুল পন্থা হতে বাধ্য।

সেদিন নজরে পড়ল কোন এক তরুণ সাহিত্য-সমালোচক সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশকে একটি মাত্র কথার আঘাতে একেবারে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। কথাটি হল 'হেঁশেলীয় সাহিত্য'। এই জাতীয় সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হল বাঙালীর সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন এবং সেই জীবন থেকে উদ্ভূত হাসি-কান্নার ইতিহাস। সুতরাং এ সাহিত্য 'হেঁশেলীয় সাহিত্য,' অর্থাৎ নিন্দনীয় সাহিত্য—অন্য জাতীয় সাহিত্যের তুলনায় তুচ্ছতর বস্তু। প্রথমেই বলা যেতে পারে, নিন্দাত্মক প্রতীক নির্বাচনে সমালোচক মহাশয় খুব সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি। ভোজনবিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে হেঁশেলঘরকে তুচ্ছতার প্রতীক বলে মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়: এখনও বাঙালীর সংসারে হেঁশেলঘরের স্থান ঠাকুরঘরের ঠিক পরেই। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও আসল প্রশ্নটা রয়ে যায়—এ কি ধরনের সাহিত্য-বিচার? সাহিত্য-বস্তু 'হেঁশেলীয়' হবে না 'হোটেলীয়' হবে, সাহিত্যে শুধু ঘরের কথা থাকবে না শুধু পরের কথা

থাকবে, সাহিত্যক্ষেত্র আঞ্চলিক হবে না সার্বভৌমিক হবে—সত্যকার সাহিত্যসমালোচনায় এ জাতীয় প্রশ্নের কোন স্থান নেই। সাহিত্য-বস্তু বা সাহিত্যক্ষেত্র নির্বাচনে সাহিত্যস্রষ্টার স্বাধীনতা সর্বদাই অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। এই নির্বাচনকে স্বীকার করে নিয়ে তবে সমালোচককে সাহিত্য-বিচারে ব্রতী হতে হবে। বড় জোর তিনি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে পারেন যে কোন বিশিষ্ট ধরনের সাহিত্যবস্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়—'হেঁশেলীয়' ভোজ অপেক্ষা 'হোটেলীয়' খানা তিনি বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু বস্তু-বিচার সংক্রান্ত ব্যক্তিগত রুচির ভিত্তিতে সাহিত্যের সামগ্রিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের চেষ্টা অপচেষ্টা মাত্র : এ জাতীয় সাহিত্য-সমালোচনা ভ্রান্ত সমালোচনা।

একবার যদি আমরা এই সাহিত্যিক বস্তুবিচারকে সাহিত্য-সমালোচনার মর্যাদা দিতে রাজী হই তাহলে কি ধরনের মতামতকে সত্য বলে মেনে নেবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে তার কিছু নমুনা দেখুন :

(১) বঙ্কিমচন্দ্র নানাবিধ প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন ; তিনি বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না ; তাঁর উপন্যাসে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী-তান্ত্রিকের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এবং তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা অলৌকিক বুজরুগি বর্ণিত হয়েছে ; হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটিকেও তিনি ঈষৎ তির্যক্ দৃষ্টিতে দেখতেন—সুতরাং তাঁকে বড় জোর একজন 'পায়োনিয়ার' বলা চলে ; শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা তাঁকে কিছুতেই দেওয়া চলে না।

(২) শরৎচন্দ্র বহু সামাজিক সমস্যার অবতারণা করেছেন, কিন্তু কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন নি—সুতরাং সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তিনি অসার্থক।

(৩) বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক নাগরিক জীবনের বেদনা-বিক্ষুব্ধ আলোড়নকে উপেক্ষা করে পল্লীজীবনকেই নিজের একমাত্র

শিল্পক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর এই পলায়নী মনোবৃত্তি তাঁর সমস্ত শিল্পসৃষ্টিকে তাৎপর্যহীন করে দিয়েছে।

(৪) রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নরনারীর যৌন সম্মেলনের কোন চিত্র কোথাও অঙ্কিত হয় নি—সুতরাং তাঁর কাব্যে 'প্যাশন' নেই; কবি ও শিল্পী হিসাবে তিনি 'অসম্পূর্ণ'।

(৫) ভারতচন্দ্রের কাব্যে নরনারীর যৌন সম্মেলনের একাধিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সুতরাং তিনি কেচ্ছা-কাহিনীর রচয়িতা মাত্র; কবি ও শিল্পী হিসাবে তিনি অপাংক্তেয়।

মনে রাখবেন, ওপরে যে কটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলাম তার একটিও আমার মনগড়া নয়। প্রত্যেকটি (ঠিক এই ভাষাতে না হলেও) ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে, এবং এই অপরূপ অভিমত-সূক্তাবলীর প্রত্যেকটির উদ্গাতা একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি।

স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্য-সমালোচনার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আহরণ করা চলত, কিন্তু আপাতত এই পর্যন্ত থাক। আশা করি, বস্তুবিচার-মূলক সাহিত্য-বিচারের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে অতঃপর আপনাদের সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকবে না।

॥ সতেরো ॥

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে অভিজাত মহিলাটি খাতায় নাম লিখিয়ে বাজারে বেরিয়েছিলেন, আমাদের দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী আজ তাঁর 'তপস্বিনী' হয়ে বনে বাস করার কথা। কিন্তু পশ্চিমী সমাজ-ব্যবস্থায় বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসের কোন ঠাঁই নেই, সেখানে মানুষ বুড়ো হতে চায় না—বার্ধক্যকে অস্বীকার করাই সেখানে হাততালি পাবার একটা বড় উপায়। তাই হঠাৎ সেদিন এই প্রায়-ভুলে-যাওয়া বৃদ্ধা বারাঙ্গনাটি মুখের বলিচিহ্নিত লোলচর্ম সুচতুর প্রসাধনের সাহায্যে বেমালুম গোপন করে পুনরায় মক্কেল পাকড়ানোর প্রত্যাশায় রাজপথের সদরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈও হয়ে গেল। বড় বড় সমালোচকরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখলেন, কাগজে কাগজে সম্পাদকীয় ছাপা হল, এবং অবশেষে জুরির বিচারে সাব্যস্ত হল, অতীতে যাই হয়ে থাকুক না কেন, এখন তাঁর বেশ্যাবৃত্তির মৌলিক অধিকার কিছুতেই হরণ করা চলবে না।

লেডি চ্যাটার্লির কথা বলছি—ডি. এচ্. লরেন্সের বিখ্যাত উপন্যাসের স্বনামধন্যা নায়িকা লেডি চ্যাটার্লি। পড়ুন আর নাই পড়ুন, বইখানার নাম আপনারা সকলেই নিশ্চয় শুনেছেন। কি প্রসঙ্গে শুনেছেন সে কথা তুলে আর আপনাদের অপ্রস্তুতে ফেলতে চাই না।

এক জন দুর্মুখ প্রবাসী বন্ধু এ সম্বন্ধে আমাকে যা লিখে পাঠিয়েছেন তার মর্মার্থ হল এই ঃ বইখানা মরে গিয়েছিল। সেন্সর-অনুমোদিত পরিমার্জিত সংস্করণটি—যা সকলের পক্ষেই এত দিন সহজলভ্য ছিল—তার সাহিত্যমূল্যের দাবিতে বেঁচে থাকতে পারে নি। পরিবর্জিত অংশগুলি পুনর্যোজনার-ফলেও দেখা গেল যে এ গ্রন্থের রূপ ও রস আধুনিক পাঠকের মনোযোগ বা শ্রদ্ধা এবং আধুনিক পুস্তক-ক্রেতার

অর্থ আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট নানা মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বইখানাকে নিয়ে সাহিত্যের বাজারে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করা হল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—Boost or bust. বইখানাকে boost করবার জন্যে এই রকম একটা হৈ-চৈএর প্রয়োজন ছিল বলেই তা সৃষ্টি করা হয়েছে। নইলে, পরিমার্জিত সংস্করণই হোক কিংবা মূল সম্পূর্ণ সংস্করণই হোক্, নিছক সাহিত্যিক বিচারে এ গ্রন্থ এমন কোন বস্তু নয় যা নিয়ে এত লোকের এত মাথাব্যথার কোন কারণ থাকতে পারে।—এই প্রসঙ্গে বন্ধু আমাকে আরও একটা সংবাদ দিয়েছেন: মামলার রায় বেরুবার অনেক আগেই নাকি সম্পূর্ণ বইখানার একটা বড় সংস্করণ (অর্থাৎ কয়েক লক্ষ পুস্তক) ছাপা-বাঁধাই হয়ে গুদামজাত হয়ে ছিল।

বন্ধুর মন্তব্যের মধ্যে যে সব ইঙ্গিত নিহিত আছে আমি অবশ্য তা বিশ্বাস করি না। এবং তার সঙ্গে আমার মূল বক্তব্যের বিশেষ কোন সম্পর্কও নেই। আমি এখানে বলতে চাই প্রধানত দুটি কথা।

প্রথম কথাটি হল ডি. এচ্. লরেন্সের এই উপন্যাসখানির সাহিত্য-মূল্য নিয়ে। পরিমার্জিত সংস্করণটি সাহিত্যপাঠক-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় নি। সুতরাং তার কথা এখন থাক। মূল উপন্যাসখানি সম্বন্ধে সেদিন একটা গল্প শুনলাম। গল্পটি যিনি বললেন তিনি বেশ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। তাঁর কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে।

প্যারিস নগরীতে এক জন প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা আছেন বা ছিলেন যিনি অন্যান্য দেশের সেন্সরের অভিশাপগ্রস্ত কিন্তু বিশিষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন পুস্তকাদি প্রকাশ করে বিপন্ন গ্রন্থকারদের সাহায্য করতেন। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' ইনিই প্রথম প্রকাশ করেন। ইনি লিখেছেন যে ডি. এচ্. লরেন্স এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রথম তাঁকেই পড়তে দেন, এবং এই পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে তিনি বার বার হাই তুলতে বাধ্য হন এবং অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় নি।

পরিমার্জিত সংস্করণটি আমরা অনেকেই পড়েছি—তার গুণাগুণ আমরা জানি। মূল পুস্তকে অতিরিক্ত কি আছে? বিশিষ্ট একখানি সংবাদপত্রের ভাষায়—'It contains many detailed descriptions of the sexual act.' এখন এই বর্ণনা সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন, যত detailed-ই হোক না, এবং যতই সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হোক না কেন, শুধু তারই জোরে একখানা মরা বইকে কিছুতেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অবশ্য এমন কেউ কেউও থাকতে পারেন যাঁরা শুধু এই বর্ণনাগুলির জন্যেই হয়তো বইখানা পড়তে চান। তাঁরা সাহিত্য-ফাহিত্যের ধার ধারেন না—সুতরাং সুযোগ পেলে পড়ুন, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁদেরও আমি একটু সতর্ক করে দিতে চাই। যে যুগে 'লোলিটা'-র মত উগ্র নুন-ঝাল দেওয়া দোপিঁয়াজির আস্বাদও কয়েক মাস মাত্র মানুষকে তাতিয়ে বা মাতিয়ে রাখতে পারে সে যুগে পঁয়ত্রিশ বছরের বাসি পোলাও পান্তার মত পান্‌সে লাগবারই সম্ভাবনা বেশি।

ডি. এচ্. লরেন্সকে আমরা মনে রাখব তাঁর ইমেজিস্ট্ কবিতার জন্যে, তাঁর অত্যাশ্চর্য ছোট গল্পগুলির জন্যে, তাঁর 'সন্‌স্ অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর মত উপন্যাসের জন্যে। এ সব বস্তু জীইয়ে রাখবার জন্যে দুনিয়া-জোড়া হৈ-চৈ তোলবার কিংবা বিজ্ঞাপনের বোমা ফাটাবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু 'লেডি চ্যাটার্লিজ্ লাভার'—!

দ্বিতীয় কথাটা হল সাহিত্যে সেন্সরশিপ প্রথা সম্বন্ধে। শুধু অশ্লীলতার অজুহাতে কোন সাহিত্যপুস্তকের প্রচার বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা সরকারের বা সরকার-সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকলে সে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে বাধ্য। রসগ্রাহী সাহিত্যপাঠক যে মন নিয়ে বই পড়ে, সরকারী কর্তব্য-সম্পাদন-রত সরকারী কর্মচারী ঠিক সেই মনটির অধিকারী কিছুতেই হতে পারেন না। তাঁর মন হবে আঁস্তাকুড়ের মাছি—আর সব ছেড়ে শুধু জঞ্জালের গাদার ওপরেই ভন্ ভন্ করতে থাকবে।

সাহিত্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রত্যেক পাঠকেরই নিজস্ব অভিমত গঠন ও পোষণ করবার অধিকার আছে। সুযোগ পেলে সেই অভিমত সে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ ও প্রচারও করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত মতামতের দাবিতে সাহিত্যকে আদালতে অভিযুক্ত করবার কিংবা দণ্ডিত করবার অধিকার কারও নেই, এমন কি কোন সরকারী কর্মচারীরও নেই—তা তিনি যতই উচ্চপদস্থ হন না কেন, যতই মোটা বেতন পান না কেন।

সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন। জীবনে অশ্লীলতার স্থান আছে, সুতরাং সাহিত্যেও তার আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। এই সাহিত্যিক অশ্লীলতার ফল সাহিত্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, নাও হতে পারে। সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিভা ও শৈল্পিক সততার ওপর। আনাতোল ফ্রাঁসের অশ্লীলতা ও পিয়ের লুই-এর অশ্লীলতা কি এক বস্তু? কিন্তু এ বিচার তো আদালতে হওয়া সম্ভব নয়!—উচিতও নয়। এর বিচার করবে বিদগ্ধ পাঠকসমাজ। এর বিচার করবে মহাকাল। সেই চরম বিচারের পূর্বে শুধু পাঠকের ও সমালোচকের অধিকার আছে নিজ নিজ ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করবার। পুলিসের বা আদালতের এ ক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই।

কিছুদিন আগে আমাদের দেশের পুলিস, কেন জানি না, হঠাৎ এই ব্যাপারে খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল। ফলে কয়েক জন নামজাদা সাহিত্যিক বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকখানা ভাল ভাল বই থেকে কিছু কিছু তথাকথিত অশ্লীল অংশ কেটে বাদ দিতে। এতে করে সমাজের কি উপকার হয়েছে জানি না, তবে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কয়েকখানি ভাল বই চিরকালের জন্যে খোঁড়া বা নুলো হয়ে গেছে।

এই সর্বনেশে সেন্সরশিপ্ প্রথা যদি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হয় তা হলে কি হবে তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন?

পেট্রোনিয়াস, রাব্‌লে, বলজ্যাক, শেক্‌স্‌পীয়র, মোপাসাঁ, সাফো, ওভিড, পদ্মপুরাণের অজ্ঞাতনামা রচয়িতা, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারতচন্দ্র (মাত্র কয়েক জনের নাম করলাম)—সবাইকে আইনের আওতায় পড়তে হবে। এবং তার ফলে হয় এঁদের বই আর বাজারে বিক্রি হতে পারবে না, আর না হয়তো সেগুলির সেন্সর-অনুমোদিত পরিমার্জিত সংস্করণ বের করতে হবে।—সাহিত্যে অশ্লীলতা যদি বেআইনী হয়, প্রাচীন বইএর বেলাতেও তা হবে না কেন ?

বস্তুত সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কিত সেন্সরশিপের এই প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, অবাঞ্ছনীয় এবং অন্যায়।

॥ আঠারো ॥

আমি যখন তরুণ ছিলাম (কথাটা আপনাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হলেও সত্য—আমিও একদিন তরুণ ছিলাম), তখন আমার চেয়ে যাঁরা বয়োবৃদ্ধ তাঁদের সম্বন্ধে ভাবতাম,—'ওঁরা বুড়োমানুষ, ওঁরা এসব কিছু বোঝেন না।'

আজ আমি বুড়ো হয়েছি। এখন আমার চেয়ে যারা বয়ঃকনিষ্ঠ তাদের সম্বন্ধে প্রায়ই ভাবতে প্রলুব্ধ হই,—'আহা ওরা ছেলেমানুষ, ওরা এসব কিছু বোঝে না।'

চেষ্টা করে নিজের মনকে শায়েস্তা করি—সর্বদা সাবধান হয়ে থাকি। বর্তমানের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, প্রথম কথাটা সত্য নয়। অতীতের স্মৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নেবার প্রয়াস পাই—দ্বিতীয় কথাটাও মিথ্যা।

মানুষ বৃদ্ধ হলেই যেমন নির্বোধ হয়ে পড়ে না, তেমনি তারুণ্য ও বুদ্ধিহীনতাও সমার্থবোধক নয়।

কিন্তু এত সব জেনেশুনেও মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকে।—তারুণ্যের একটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের পক্ষে যদি দ্বিতীয় কথাটা সত্য হত তা হলেই বোধ হয় ভাল হত।

বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের কথা বলছি।

এঁরা বড় বেশি বোঝেন। বড় বেশি হিসেবী মানুষ এঁরা। বয়সে কাঁচা ও কচি হলেও এঁদের মন এর মধ্যেই বিষয়বুদ্ধির তাপে শুকিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে।—এবং এই অকালপক্কতার ফল বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক হয় নি।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। [দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু তবু যদি কারও মাথায় কোন টুপি ঠিক মানানসই হয়ে বসে, তা হলে তা কাকতালীয় মাত্র।]

তরুণ কবি। সারাদিন মনের মধ্যে কবিতার সুর গুঞ্জরণ করে ফিরছে, আর তারই পাখায় ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্রগাঢ়তম আবেগ ও নিবিড়তম অনুভূতির কাব্য-বলাকা। ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় সে কবিতা মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছে এবং তার রূপরসসমৃদ্ধি রসিকজনের প্রশংসা লাভ করছে। কিন্তু আধুনিক কাব্যজগতের গোষ্ঠীপতিদের সে কবিতা পছন্দ হল না। তাঁরা রায় দিলেন, 'হ্যাঁ, লেখবার হাত আছে—চেষ্টা করলে হতে পারে। তবে কিনা—ছন্দ মিল প্রভৃতি মামুলি প্রথা পরিহার করতে হবে, কাব্যবস্তু হিসাবে প্রেম ও প্রকৃতিকে বর্জন করতে হবে, ভাষাকে ব্যাকরণ ও লজিকের কৃত্রিম বন্ধন ছিঁড়ে ওপরে তুলতে হবে, আর যেখানে যত ফাটল আছে সব মনন দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।'

কবি সব বুঝলেন। তাঁর মনের ভিতরকার হিসেবী মানুষটা জেগে উঠল। খ্যাতি চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, সম্ভব হলে কিছু অর্থও চাই। কিন্তু গোষ্ঠীপতিদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে কাব্যচর্চা করে এর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়—অন্তত অদূর ভবিষ্যতে তো কিছুতেই নয়। সুতরাং নিজের মন যা চায় তা শিকেয় তোলা থাক—কবি কোমর বেঁধে ফরমায়েশী কাব্য রচনায় লেগে গেলেন।

বাংলা সাহিত্যের সংসারে আর একজন শক্তিমানের অপমৃত্যু ঘটল, আর একজন বুদ্ধিমান আবির্ভূত হলেন।

তরুণ ঔপন্যাসিক।—এই ঔপন্যাসিকেরাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বাজারের সবচেয়ে বুঝদার মানুষ, সবচেয়ে হিসেবী কারবারী। একখানা উপন্যাস বাজারে ছাড়বার আগে যে কত কথা ভাবতে হয়, কত দিক সামলাতে হয়, 'কত বুদ্ধি খরচা করতে হয়, পাঠকেরা তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

প্রথমেই ধরুন, উপন্যাস গতরে বেশ ভারী হওয়া দরকার, নইলে রয়াল্‌টির অঙ্ক যথোপযুক্তরূপ মোটা হবে না। আর মোটা টাকাই যদি হাতে না এল তবে উপন্যাস লিখে লাভ কি? সুতরাং অবান্তর

বর্ণনা, অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, চিন্তানুবর্তনের প্রলাপ আর অপ-দার্শনিকতার বাগাড়ম্বর যত্র-তত্র ঢুকিয়ে দাও। উপন্যাসের বেলায় মেদবাহুল্য এবং শোথ-রোগ দুইই লাভজনক বস্তু।

তার পর উপন্যাসকে 'সমাজসচেতন' হতে হবে, নইলে উল্লাট সমালোচক ও পাঠকেরা তার মধ্যে কোন 'তাৎপর্য' খুঁজে পাবেন না। তাঁদেরও তো খুশি রাখা দরকার! কাজেই উপন্যাসের মধ্যে অতি সাবধানে অল্প এক ডোজ্ শ্রেণীসংগ্রাম ঢুকিয়ে দিতে হবে, এবং দেখিয়ে দিতে হবে যে সমাজবিরোধী পুঁজিপতিরা সরকারকে আদৌ ভয় করে না, কারণ সরকার পরোক্ষে তাদের সমর্থনই করে থাকে। এই ব্যাপারটা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় একটা অত্যাবশ্যিক ফর্মুলায় পরিণত হয়েছে।

তা ছাড়া, আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রত্যেক বাংলা উপন্যাসে আজকাল অন্তত পক্ষে একটা করে অতি কুৎসিত অশ্লীল দৃশ্যের বা ঘটনার অবতারণা করা হযে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির কোন শৈল্পিক প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ব্যবসায়িক প্রয়োজন আছে। সবদেশেই মস্ত বড় একদল করে পাঠক আছেন যাঁরা অশ্লীলতার জন্যেই অশ্লীল সাহিত্যের গুণগ্রাহী—আমাদের দেশেও আছেন। বইএর বাজারের আশেপাশে একটা কালো-বাজারী আঁস্তাকুড় এঁদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত উপন্যাসে যদি কিছু অশ্লীলতার ফোড়ন দিলে এঁদেরও ক্রেতা হিসাবে পাওয়া যায় তা হলে গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুজনেরই লাভ। সুতরাং তরুণ ঔপন্যাসিক প্রগতির দোহাই পেড়ে নিঃসঙ্কোচে পিঁয়াজ-রসুন ও গরম-মশলার বেসাতি খুলে বসেন।

জানি, অনেকে ইউরোপীয় ও আমেরিকান উপন্যাস-সাহিত্যের নজির দিয়ে আমার এ কথার প্রতিবাদ করতে চাইবেন। কিন্তু চোখ ও মন দুইই খোলা রেখে যদি কেউ ঐ সব বিদেশী উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করেন তা হলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে তাদের সম্বন্ধেও

কথাটা ঠিক সমপরিমাণে সত্য। সাহিত্যে অশ্লীলতা বস্তুটা সব সময়ে নিন্দনীয় নয়ঃ জীবননিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি রূপে যে অশ্লীলতা আপনিই এসে পড়ে তাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়াই ভাল। কিন্তু যে অশ্লীলতা হিসেবী মতলববাজ মনের সুপরিকল্পিত সৃষ্টি, রিরংসার উদ্দীপনা ব্যতীত যার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, বিশেষ এক শ্রেণীর পাঠক পাকড়ানোর জন্যে যাকে টোপের মত ব্যবহার করা হয় —সে অশ্লীলতা উপন্যাস-সাহিত্যের তথা সর্ববিধ সাহিত্যের পক্ষে সত্যই সর্বনাশা বস্তু। ['লেডি চ্যাটার্লিজ্‌ লাভার'-এর সম্পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর এই শ্রেণীর পাঠকদের কথা ভেবেই পেঙ্গুইন প্রকাশনের জনৈক বড়কর্তা বলেছিলেন, 'Yes, the book is selling very well,—but all for the wrong reason.']

এর ওপর আছে সিনেমা-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে কি প্রবীণ কি তরুণ সব ঔপন্যাসিকেরই মনের রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে। ফলে আজকালকার প্রত্যেক বাংলা উপন্যাসই এক-একখানি ছদ্মবেশী সিনারিও। আমি কি লিখতে চাই, আমি কি লিখতে পারি—এসব কথা আজ অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে ; চিত্রপরিচালক যা চাইতে পারেন সাহিত্য-গগনের তাইই হয়ে উঠেছে একমাত্র ধ্রুবতারা। সুতরাং ঘটনার পর ঘটনা গেঁথে যাও, মাঝে মাঝে আমদানি কর হাততালি-নিয়ন্ত্রক 'নাটকীয় মুহূর্ত,' আর, প্রয়োজন থাক বা না থাক, সাজিয়ে যাও চোখা চোখা সংলাপের মালা—যা অমুক অমুক অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বারা উচ্চারিত হলে সহজেই জনসাধারণের চিত্তজয় করতে পারবে।

আরও অনেক আছে—আরও অনেক ফন্দিফিকির, আরও অনেক বুদ্ধির খেলা। প্রকাশক-নির্বাচনের দড়িটানাটানি, পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশ, পুরস্কারলাভের জন্য ক্যান্‌ভাসিং—এই নেপথ্য-নাট্যের সব খবর আমার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জানি যে সাহিত্যবুদ্ধির চেয়ে ব্যবসায়বুদ্ধিই এ ব্যাপারে প্রবলতর

হয়ে ওঠে। ফলে ব্যবসায়িক লাভ যতটা হয় সাহিত্যিক লাভ ততটা হতে পারে না।

তরুণ ছোটগল্প-লিখিয়েদের কথা বেশি লিখতে চাই না, কারণ আজ তাঁরা বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন। পাঠকেরা তাঁদের লেখা পড়তে চায় না, প্রকাশকেরা ছাপতে চায় না।

তবু তাঁরাও হিসেবী বুদ্ধির পরিচয় দিতে ছাড়েন না। কেউ কেউ এমন ভাবে পর পর সাজিয়ে গল্প লেখেন যে সেগুলোকে জোড়াতাড়া দিয়ে উপন্যাস বলে চালিয়ে দেওয়া যায়—যদিও এর ফলে গল্পগুলো গল্প হয় না, এবং উপন্যাসও উপন্যাস হয় না। আর একদল ভুঁইফোঁড় 'নতুন রীতির' দলে ভিড়ে পড়েন এবং গোষ্ঠীর মার্জিমাফিক গল্প রচনা শুরু করে দেন। সস্তা এবং ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহ এঁদের আলেয়ার মত প্রলুব্ধ করে বিপথে নিয়ে যায়।

প্রবীণ সাহিত্যকদের এ আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছি। তাঁদের পক্ষে যা হওয়া সম্ভব ছিল তা তাঁরা হয়ে গেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ করে আর কোন লাভ নেই—তাঁদের কোন পরামর্শ দেবার চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র।

কিন্তু তরুণ সাহিত্যিকদের সামনের পথ এখনও যথেষ্ট দীর্ঘ, তাঁদের হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই—তাঁরা একটু কম হিসেব করে পথ চলুন। তাঁরা শক্তিমান—নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিজস্ব মত, পথ, রীতি ও নীতি অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলতে দিন। তাঁরা শক্তিমান—কেন স্বেচ্ছায় হীনচেতা বুদ্ধিমানের পদবীতে নেমে আসতে চাইবেন? সাম্প্রতিক হাততালি, সস্তা সুখ্যাতি, দলাদলির উত্তেজনা, অগ্রিম রয়াল্‌টির দাদন, পরস্পর-পিঠ-চুলকানির বাঁধন—সব প্রলোভন অগ্রাহ্য করে তাঁরা স্বধর্মে স্থিতধী হয়ে অবস্থান করুন। এত তাড়া কিসের? সবই হবে।

মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা। 'আমি রবীন্দ্রনাথকে

দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করি না'—শুধু এই কথা বলতে পারলে তরুণ কবি ধনকুবেরের মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারতেন। তা তিনি বলেন নি—ফলে অপমানিত হয়ে পথে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হয়েছে।

আরও অল্পদিন আগের কথা। তরুণ সাহিত্যিক দৈনিক একটা টাকা উপার্জন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। এমন সময় চাকরি হাতে এল—কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে: বেতন মাসিক পাঁচশো টাকা (এখনকার দু-হাজারের সমান)। চাকরি তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন—বললেন, 'আমার সাহিত্যসাধনার ব্যাঘাত ঘটবে।'

এঁরা 'সাবধানী পথিক' ছিলেন না।

বর্তমান কালের তরুণ সাহিত্যিকেরাও যেন তা না হন।

॥ উনিশ ॥

বাঙালী বড় ছিঁচকাঁদুনে জাত। অন্তত সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্য পড়ে তাই মনে হয়। গোমড়ামুখো নায়ক-নায়িকার দল বিনা প্রতিবাদে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—হয় ভিলেনের হাতে, নয় অদৃষ্টের হাতে, নয় 'জীবনের সামগ্রিক ব্যর্থতার' হাতে; তার পর আর সব পথ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত গতিতে ট্রাজেডির পথে এগিয়ে চলেছে। না পারে রেগে আগুন হয়ে উঠে যা-তা একটা করে বসতে, না পারে সমস্ত ব্যাপারটাকে হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দিতে। বাঙালী কবির আশা—'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস'—অলীক কল্পনা মাত্রই হয়ে রইল।

কিছুদিন আগে জনৈক অবাঙালী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের এখন প্রয়োজন বেশ কিছুদিন ধরে চুটিয়ে বোম্বাই ফিল্ম্ দেখা—যাতে প্রচুর পরিমাণে নাচ-গান-হাসি-হুল্লোড় আছে, আর আছে বাহাদুরকা খেল। হাণ্টারওয়ালা নায়ক আর পিস্তলওয়ালী নায়িকার হাতে না পড়লে তোমাদের রোগ সারবে না।'

কথাটা শুনে প্রথমে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উল্লেখ করে কি একটা প্রতিবাদও করেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, একটু রঙ চড়িয়ে বললেও তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। আমাদের এই রোগটা হল ছিঁচকাঁদুনেবৃত্তি—এবং তার মূলে আছে মারাত্মক self-pity. দেখ আমরা কত ভাল, কিন্তু কেউ আমাদের বুঝল না; আমরা কত বড়, কিন্তু কেউ আমাদের মানল না; কত কথা আমাদের বলবার আছে, কিন্তু কেউ তা শুনল না—সহস্র নালিশের ঘ্যানঘ্যানানিতে আমাদের জাতিজীবন অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই জাতিজীবন থেকে উদ্ভূত যে সাহিত্য তা কি কখনও সুস্থ সাহিত্য হতে পারে?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত হতাশ প্রেমিক নায়কেরা যক্ষ্মারোগের ট্র্যাজিক কাশি কাশতে কাশতে অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করতেন। এখন রোগটা আরও গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, দেহ ছেড়ে মনের মধ্যে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। এ যুগের নায়কেরা অত সহজে মরে না। তারা শুধু কথা বলে। আর সে কত রকমের কথা—অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, অনীহা, অবচেতনা, আত্মরতি, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য; শুনতে শুনতে পাঠকের মাথায় খুন চেপে গেলে তবেই তাদের মরবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আধুনিক কথাসাহিত্যের খোলা ক্ষেতে ব্যর্থতার জাবর কাটতে কাটতে যে সব নরনারীকে বিচরণ করে বেড়াতে দেখা যায় সত্যই তারা অতি বিচিত্র ধরনের জীব। ধর্মে তাদের আস্থা নেই, কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে কোন আপত্তি নেই। কর্মে তাদের স্পৃহা নেই, কিন্তু কর্মফলের প্রতি লোভ আছে ষোল আনা। প্রেম তাদের কাছে প্রয়োজনেরই নামান্তর মাত্র, কিন্তু তবু ব্যভিচারের নামে রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে। তারা নাকি সবাই শুধু 'যুগযন্ত্রণার প্রতীক'। জীবন সম্বন্ধে তারা যে শুধু সম্পূর্ণরূপে 'বিবিক্ত' ও 'নির্মোহ' তাই নয়, জীবনের প্রতি ঘৃণাও তাদের অপরিসীম।

যুগযন্ত্রণার এই সব প্রতীকদের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের একটা প্রশ্ন করতে চাই। নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের নূতন নরনারীরা নব-বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ পরে সারা জীবন ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করে কেন? যে জীবন সম্বন্ধে তাদের এমন 'নির্মোহ অনীহা', যে জীবনের প্রতি মর্মান্তিক ঘৃণা প্রকাশ না করে তারা এক চুমুক মদ্যপান কিংবা প্রেমিকাকে একটা চুম্বনও করতে পারে না, সে জীবনের ভার বহন করে বেড়াতে তারা রাজী হয় কেন? ঘুমের ওষুধের মাত্র দশ বারোটা বড়ির সাহায্যে অথবা with a bare bodkin তো তারা অতি সহজেই সব ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলতে পারে, এবং যন্ত্রণা, দাহ, গ্লানি, তিক্ততা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য—সব কিছুর হাত থেকে পাকাপাকি ভাবে

রেহাই পেতে পারে। তা হলে গল্পগুলো আর এক পাতার বেশি বাড়তে পায় না, উপন্যাসগুলোও দু-চার পরিচ্ছেদেই শেষ হয়ে যায়; আমাদের মত পাঠকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। আহা—এমন দিন কি হবে মা তারা!……

জীবনের প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে, জীবনকে সত্য-সত্য ভালবাসতে না জানলে কবি যদি বা হওয়া চলে, কথাসাহিত্যিক, বিশেষ করে ঔপন্যাসিক হওয়া কদাপি সম্ভব নয়। ছিঁচকাঁদুনে মনের সৃষ্টি ছিঁচ-কাঁদুনে কথাসাহিত্য একটা জাতিগত ব্যাধির লক্ষণ মাত্র—এবং এ ব্যাধিরও দাওয়াই আছে।

আসলে জীবন বস্তুটা মোটের ওপর খুব মন্দ নয়। ভাল আছে মন্দ আছে, আলো আছে অন্ধকার আছে, হাসি আছে কান্না আছে—এবং সব কিছু মিলিয়ে পাল্লাটা ভালর দিকেই ঝুঁকে আছে। জীবনে বৈচিত্র্য আছে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে আছে একটু উদ্বৃত্ত আনন্দ। তাই আমরা জীবনকে শুধু সহ্য করি না, জীবনকে ভালোবাসি—তাই মানুষ শুধু কাঁদে না, মানুষ হাসেও।

মানুষ হাসে। এই সত্যক থাটা যে সব সাহিত্যিক ভুলে যাবেন ভুলের মাশুল তাঁদের অবশ্যই দিতে হবে—মানুষের জগৎ তাঁদের কিছুতেই মার্জনা করবে না। 'Timon of Athens'-এর রচয়িতা শেক্‌স্‌পীয়রকে মার্জনা করে নি, 'Jude the Obscure'-এর রচয়িতা হার্ডিকে করে নি, আধুনিক বাঙালী কথাসাহিত্যিকদেরও করবে না।

এই সত্য কথাটা ভুলে যাবার ফলেই আমাদের জাতিজীবনে ও সাহিত্যে ছিঁচকাঁদুনে-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়েছে, গোমড়ামুখো নর-নারীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে।•

এ রোগের সবচেয়ে শক্তিশালী দাওয়াই হল হাসি।

এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় জানতেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায় জানতেন, রাজশেখর বসু জানতেন। এঁরা সবাই স্বর্গত। যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদের মধ্যে

একথা জানেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, প্র. না. বি., শিবরাম চক্রবর্তী। এঁরাও বয়সে প্রবীণ। আর এক ধাপ নীচে নেমে এসে চারিদিকে তাকালেই কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখতে হয়—যুগযন্ত্রণার নিবিড় নীরন্ধ্র নিরেট মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার। হাসির বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে তার কোথাও একটুখানিও চিড় খায় নি। তরুণতর বাঙালী সাহিত্যিকেরা আজ সম্পূর্ণরূপে হাসতে ভুলে গেছেন—কৌতুক-সাহিত্যকে নিম্নস্তরের সাহিত্য বলে ভাবতে শুরু করেছেন।

কৌতুকরস প্রীতি ও সহানুভূতির রস, কৌতুকবুদ্ধি দার্শনিক বুদ্ধি, কৌতুকদৃষ্টি সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার দৃষ্টি। যে সাহিত্য এই রস, এই বুদ্ধি ও এই দৃষ্টিকে পরিহার করে চলে সে সাহিত্য প্রীতিহীন, সহানুভূতিহীন, অদার্শনিক, জীবন-সমালোচনায় ও আত্মসমালোচনায় অক্ষম। সে সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যিকেরা নিজে যতই আত্ম-প্রসাদ অনুভব করুন না কেন, মানুষ তা গ্রহণ করবে না—কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হলে তা গিল্টি বলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আরিস্টোফানিস থেকে রাজশেখর বসু পর্যন্ত যে বিশ্বব্যাপী কৌতুকসাহিত্যের ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে তা থেকে এক আঁজলা জল তুলে পান করবার সৌভাগ্যও বোধ হয় আমাদের দেশের এই সব ছিঁচকাঁদুনে সাহিত্যিকদের জীবনে ঘটে নি। এঁরা বোধ হয় সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন ডি. এচ্. লরেন্স ডিকেন্সের চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক, রাব্লে-র রচনার চেয়ে সার্ত্রে'র রচনার সাহিত্যিক মূল্য বেশি—এবং বিশ্বাস করেন এই কারণে যে ডিকেন্স অথবা রাব্লে-র সাহিত্য এঁরা কোন দিন পড়েন নি। তা যদি হয় তা হলে এঁরা কৃপার পাত্র—এঁদের ওপর রাগ করে কোন লাভ নেই।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কৌতুকসাহিত্যের প্রয়োজন অন-স্বীকার্য। এবং এই কৌতুকসাহিত্য পরিবেশনের ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের সাহিত্যশক্তিও অনস্বীকার্য হওয়া প্রয়োজন। তরুণতর

সাহিত্যিকদের মগজ যে নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে নূতন কৌতুক-প্রতিভার সূর্যোদয়ে কবে তার অবসান হবে বসে বসে তারই প্রতীক্ষা করছি।

ব্যাধির specific অর্থাৎ প্রধান দাওয়াই বাতলে দিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ রোগমুক্তির জন্যে আরও কয়েকটি সাহায্যকারী দাওয়াইএর দরকার। সাহিত্যের শরীরে আরও কয়েকটি রসের অ্যাম্পিউল ইনজেক্‌ট্‌ করে দিতে হবে।

অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রস, রহস্যের রস, রোমাঞ্চের রস, স্বপ্নবিলাসের রস, অসম্ভব ও আজগুবির রস—সবই সঞ্চার করতে হবে সাহিত্যের মধ্যে। কারণ এগুলি সবই বিরেচক রস,—সাহিত্যদেহ থেকে যুগযন্ত্রণার অপক্ক রস নিষ্ক্রান্ত করে দিয়ে তাকে নিরাময় করে তুলতে সাহায্য করবে।

হাসির গল্প তো চাই-ই। তা ছাড়া ভূতের গল্প চাই, গোয়েন্দা-গল্প চাই, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প চাই, আজগুবি গল্প চাই, অতীতের গল্প চাই, ভবিষ্যতের গল্প চাই। ডেলি প্যাসেঞ্জার অথবা দোকান-কর্মচারী অথবা neo-literate-দের মনে সুড়সুড়ি দেবার মত গল্প নয়—সত্যকার সাহিত্যরসসমৃদ্ধ বিদগ্ধচিত্তরঞ্জক রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। অর্থাৎ—Wanted a genius,—or rather, several geniuses.

॥ কুড়ি ॥

হাস্যরসের মৌলিক উপজীব্য হল অসঙ্গতি। কথাটা নূতন কিছু নয়, এর আগেও বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু এর পূর্ণ তাৎপর্যটুকু ভাল করে বুঝতে হলে আরও একটু তলিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে। স্বাভাবিক ভাবে যা প্রত্যাশা করা হয় তা না ঘটে যদি হঠাৎ বেখাপ্পা ধরনের অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যায় তাহলে আমরা হাসি। পরিণতিটা যদি অতিমাত্রায় ভয়াবহ বা মারাত্মক ধরনের কিছু হয় তাহলে অবশ্য হাসি না—কারণ তখন ব্যাপারটা অসঙ্গতির গণ্ডি পার হয়ে ট্রাজেডির রাজত্বে পৌঁছে যায়। স্বাভাবিকতার বিপর্যয়ের পরে যদি আবার দ্রুত স্বাভাবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তবেই সেই বিপর্যয়কে আমরা অসঙ্গতি বলে বর্ণনা করতে পারি। একটা স্থূল ধরনের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে বেরোবার উপায় নেই, কাজেই দোতলার জানালায় বসে বসে মৌসুমী সৌন্দর্য উপভোগ করবার চেষ্টা করছি। এমন সময় দেখতে পেলাম একটি স্থূলকায় মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়ে নীচের রাস্তা ধরে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন। নিশ্চয় কোন জরুরী দরকার আছে, নইলে এমন দুর্যোগের মধ্যে কি কেউ পথে বেরোয় ? যাই হোক, ভদ্রলোক নির্বিবাদে নিজের গন্তব্যের দিকে চলে যাবেন এই প্রত্যাশা করছি, এমন সময় তিনি হঠাৎ পা পিছলে দুম্ করে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। এই অপ্রত্যাশিত অসঙ্গতির ফলে আর একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক,—অর্থাৎ আমি, মহা খুশি হয়ে উঠলাম এবং হাসতে হাসতে প্রায় বেসামাল হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোকের কতখানি আঘাত লেগেছে বা লাগতে পারে আমার সেকথা চিন্তা করা উচিত ছিল, ছুটে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি সে সব কিছুই করলাম না—শুধুই হাসতে লাগলাম।

কিন্তু ফুটবল খেলার মাঠে খেলোয়াড়কে আছাড় খেয়ে পড়তে

দেখলে দর্শকেরা হাসে না, কারণ এক্ষেত্রে আছাড় খাওয়াটা তেমন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। একে অসঙ্গতি বলা চলে না।

আবার ধরুন, তিনতলা সমান উঁচু ভারার ওপর রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে। ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে তার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে একজন মজুর হঠাৎ সেখান থেকে নীচে পড়ে গেল। এ পতন দেখেও কেউ হাসবে না। কারণ, প্রথমত ঐ ধরনের কাজ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, উঁচু ভারার ওপর থেকে সর্বদাই পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত এর ফলে মজুরটির প্রাণহানির বা গুরুতর আঘাত পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এরকম ট্র্যাজিক ব্যাপারকেও অসঙ্গতি বলা চলে না।

একটা কথা এইখানেই বলে রাখা ভাল। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মতে, হাস্যরসের মধ্যে সর্বদাই সূক্ষ্ম একটু নিষ্ঠুরতার আনন্দ মিশ্রিত থাকে, নইলে পরের দুর্দশা দেখে আমরা খুশি হয়ে উঠি কেন? কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা আংশিক সত্য মাত্র। হাস্যরসের আনন্দ নিছক নিষ্ঠুরতার আনন্দ নয়, এর মধ্যে এমন একটা নির্মল নির্লিপ্ততা আছে যার ফলে মন সরস ও কোমল হয়ে ওঠে। চিত্তবৃত্তি হিসাবে নিষ্ঠুরতার প্রধান লক্ষণ কোমলতা নয়, কঠোরতা।

মনে করুন, যে ভদ্রলোকটিকে আমি আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলাম তিনি আমার নিকট প্রতিবেশী, সুতরাং মহাশত্রু—দশ বছর ধরে আমার বিরুদ্ধে ছোট বড় নানা আদালতে মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই জন্যেই কি তাঁকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখে আমি আনন্দে হেসে উঠব? বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, ব্যাটা যেমন পাজি তেমনি শাস্তি হয়েছে—ভেবে খুশি হয়ে উঠব? তা তো নয়, বরং তার উল্‌টোটাই সত্য। আমি হাসব একটা মজার ব্যাপার অর্থাৎ অসঙ্গতি দেখে। আর এই হাসির ফলে আমার মনের বিদ্বেষের মালিন্য বেশ একটু হাল্‌কাই হয়ে উঠবে। অন্ততঃ সেই মুহূর্তটির জন্যে ভদ্রলোককে আমি শত্রু বলে ভাবতে পারব না।

বস্তুত হাস্যরসের মধ্যে আমরা যে মনোভাবের পরিচয় পাই সেটা দার্শনিক দ্রষ্টার মনোভাব। দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুর সঙ্গে নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে জড়িয়ে ফেলে আমরা প্রতিনিয়ত যে একটা অপ্রীতিকর জটিলতার সৃষ্টি করে থাকি তা থেকে অন্তত সাময়িকভাবে মুক্ত হতে না পারলে প্রাণ খুলে হাসা অসম্ভব।

হাস্যরস অবলম্বন করে যাঁরা শিল্পসৃষ্টি করতে চান তাঁদের বেলায় কথাটা আরও বেশি করে সত্য।

পরম পূজনীয় ভাসুর ঠাকুরকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলে ভাদ্রবৌ হাসবে, আপিসের বড়বাবুকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলে কেরানিরা হাসবে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশনেতাকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলে জনসাধারণ নিঃসঙ্কোচে হাসবে। অর্থাৎ সত্যকার গণতান্ত্রিক রস যদি কিছু থাকে তো এই হাস্যরস। হাস্যরসিক সাহিত্যিককে সমদর্শী হতেই হবে। তাই বোধ হয় আধুনিক যুগের শ্রেণীসচেতন সাহিত্যে এই রসটির ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের হাসির খোরাক জোটানোর জন্যে পথে ঘাটে লোক ক্রমাগত আছাড় খেয়ে পড়ছে না;—পড়বার প্রয়োজনও নেই। অসঙ্গতি শুধু ঘটনার রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের চরিত্রে, আলাপনে আচরণে, আবেগে উচ্ছ্বাসে, প্রণয়ে কলহে, প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে শত সহস্র অসঙ্গতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যহ খবরের কাগজে আমরা যে সব কথা পড়ি, যে সব খবর পাই, তার মধ্যে হাস্যকর অসঙ্গতি প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান। প্রকৃতির নিয়মে অসঙ্গতি আছে, এমন কি বিধির বিধানেও অসঙ্গতির অভাব নেই। কিন্তু তবু আমরা এরই মধ্যে দিব্য গম্ভীরমুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে যাচ্ছি—হাসি আমাদের জীবনের নিত্যানুষঙ্গ নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

এর কারণ হচ্ছে এই যে জীবনের সর্ববিধ অসঙ্গতি দেখবার চোখ আমাদের নেই, সঙ্গতি অসঙ্গতির মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও আমাদের নেই। অথচ যে জীবনে হাসি নেই সে জীবন

অসম্পূর্ণ,—শুধু অসম্পূর্ণ নয়, ব্যাধিগ্রস্ত। Neurosis-এর প্রধান লক্ষণ হল হাসবার ক্ষমতার অভাব। মূর্খেরাও সহজে হাসতে চায় না। তাই আমাদের হাস্যরসিক সাহিত্যশিল্পীদের শরণাপন্ন হতে হয়। এঁরা এক ধরনের দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। কোন অসঙ্গতিই এঁদের চোখ এড়াতে পারে না। জীবনকে এঁরা সমগ্র ভাবে দেখতে পারেন, এবং সেই জন্যেই জীবনের সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতিকে এঁরা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, মার্জনা করতে পারেন।

উচ্চতম পর্যায়ের হাস্যরস নির্লিপ্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়; তার ভিত্তি সর্বজনীন সমদর্শিতার ওপর;—তার প্রধান লক্ষণ অবজ্ঞা নয়, ঔদাসীন্য; নিষ্ঠুরতা নয়, মমত্ববোধ ও মার্জনা।

অন্য সর্বজাতীয় সাহিত্যে 'সু' ও 'কু'-র মধ্যে পার্থক্যটা বড় বেশি প্রকট করে দেখানো হয়। চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা-সংস্থানে সংমিশ্রণ-জনিত জটিলতা যতই থাক না কেন, ভালমন্দ ও ছোট-বড়র পার্থক্য সম্বন্ধে লেখক ও পাঠক সর্বদাই সচেতন থাকেন। কিন্তু হাস্যরসিকের দৃষ্টিতে সব সমান। মনে হয় তিনি যেন 'comic philosophy'-র এরোপ্লেনে চড়ে পৃথিবী থেকে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছেন; পৃথিবীর মহীরুহ ও পৃথিবীর পিপীলিকা, পৃথিবীর পর্বত ও পৃথিবীর উইঢিবি এখন তাঁর কাছে সমান বলে মনে হচ্ছে। সব কিছুরই ওপর তাঁর অনুকম্পা ও প্রীতি সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে।

হাস্যরসিক মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ঔদার্য ও ব্যাপ্তি। জীবনের কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়, কিছুই অবহেলার বস্তু নয়। সব কিছুর মধ্যেই তিনি আনন্দের সন্ধান পেয়ে থাকেন, সব কিছুকেই তিনি আমাদের আনন্দের বস্তু করে তুলতে পারেন—ইংরেজিতে একেই বলা হয় 'the comedy view of life'—সহজাত সংস্কার হিসাবেই শিল্পীর মনে এর উদ্ভব হতে পারে, সাধনার দ্বারা একে অর্জন করা সম্ভব নয়।

ব্যাপ্তি ও ঔদার্যের কথা বললাম বলে কেউ যেন মনে না করেন যে হাস্যরসিকের শিল্পদৃষ্টি অগভীর বা পল্লবগ্রাহী। পূর্বেই বলেছি এক ধরনের দিব্যদৃষ্টির অধিকারী না হলে উচ্চতম পর্যায়ের হাস্যরস সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই দিব্যদৃষ্টির মধ্যে প্রধানত দুটি উপাদান বর্তমান—intellectual subtlety ও intuitive penetration, অর্থাৎ জীবনের বাহ্য আবরণ ভেদ করে ভিতরকার মৌলিক অসঙ্গতিগুলি বাইরে টেনে আনবার সহজ ক্ষমতা থাকা চাই, এবং তারপর সূক্ষ্ম কলাকৌশলের সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা থাকা চাই। হাস্যরসিক সাহিত্যশিল্পীরা তথাকথিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করে বেড়ান না বটে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে তাঁরা কারও চেয়ে খাটো নন।

আরও একটা কথা আছে। জীবনধর্মের নিজস্ব কতকগুলি অসঙ্গতি আছে। জীবনস্রোত নির্বিবাদে একটানা বয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক এক সময় থম্‌কে দাঁড়ায় বা আচম্‌কা মোড় ঘুরে যায়। তখন এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এগুলির নাম দিয়েছেন 'Life's little ironies'. এই irony বস্তুটা যেন শাঁখের করাত—যেতেও কাটে আসতেও কাটে। এর মধ্যে হাসি ও অশ্রু দুইএরই প্রচুর সম্ভাবনা নিহিত আছে। ট্র্যাজিক লেখকেরা এর সদ্ব্যবহার করেন পাঠকের মনকে আকস্মিক আঘাত দিয়ে বেদনাবিহ্বল করে তুলতে, হাস্যরসিকেরা এর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিটুকুকেই বড় করে দেখান। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হোক না কেন, এই irony-র সন্ধান পেতে হলে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

এক রকমের হাসি আছে উদ্ভট ঘটনাবিন্যাস থেকেই যার উদ্ভব হয়, —এর ভিতরকার রসটিকে কৌতুকরস (fun) নাম দেওয়া যেতে পারে। আবার মগজে সুড়সুড়ি দিয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে পুলকিত

করে তুলেও মানুষকে হাসানো যায়,—একে বলা চলে রঙ্গরস (wit)। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হাস্যরস মানুষের সমস্ত সত্তাকে পুলকিত করে তোলে, তার মনের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। ইংরেজিতে এই ধরনের হাস্যরসকে 'হিউমার' নাম দেওয়া হয়। বাংলায়ও আপাতত ঐ কথাটি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। কৌতুকের হাসি নিছক হাসি, তাতে আর কোন বস্তুর ভেজাল নেই,—হাসি ফুরিয়ে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রঙ্গরসের হাসি মুচ্‌কি হাসি, বুদ্ধিবিলাসের হাসি, —এর পিছনে আছে দাম্ভিক মনের ঈষৎ অপ্রীতিকর আত্মসন্তোষ। অনেক সময় এই হাসিকে ব্যবহার করা হয় আক্রমণের উদ্দেশ্যে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে অন্যায়ের সমালোচনা ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হিউমার অন্যজাতীয় বস্তু ; হিউমারের হাসি দার্শনিক হাসি ; এর ভিতরে আছে জগতের সব কিছুর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি অনুকম্পা ও মমত্ববোধ। 'আমিত্বের প্রসার' না হলে এ হাসি কেউ হাসতে পারে না। সেই জন্যেই অনেক সময় এ হাসি যখন আমরা হাসি তখন হয়তো আমাদের গলা ধরে আসে, চোখে জল টল্‌মল করতে থাকে। ভালবাসি বলেই হাসি, আবার ভালবাসি বলেই কাঁদি। এ হাসি হাসতে হলে মানসিকতার দিক দিয়ে 'ক্যাথলিক' হওয়া প্রয়োজন, 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' হলে চলবে না ; মনে প্রাণে বিশ্বাস করা চাই, 'In my Father's house are many mansions' ; এবং 'It takes many sorts to make a world.'

॥ একুশ ॥

বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে আমরা যে শিল্প-প্রেরণার আত্মপ্রকাশ দেখতে পাই তা সম্পূর্ণরূপে নাগরিক সমাজ ও নাগরিক জীবন থেকেই উদ্ভূত। সাহিত্যের ইতিহাসের ভাষায় যে সব বাংলা বইকে 'বীজোপন্যাস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—যেমন মনে করুন 'কলিকাতা কমলালয়' কিংবা 'নববাবুবিলাস' কিংবা 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'—সেগুলির একমাত্র উপজীব্য ছিল নগর-জীবন। কি চরিত্রে, কি পরিবেশে, কি ঘটনাবিন্যাসে নগর-জীবনের বহির্ভূত কোন চিত্রই এদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি। আর তখনকার দিনে তা না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংঘাতের ফলে বাংলাদেশের চিন্তাজগতে যে বিপ্লবাত্মক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল—প্রাথমিক যুগে তা একান্তভাবে এই কলিকাতা নগরীর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার পল্লী-জীবন তখনও চিন্তাহীন আলস্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের তমসায় নিদ্রাচ্ছন্ন। এই সব ব্যঙ্গাত্মক, সংস্কার-প্রয়াসী চিত্রজাতীয় রচনার লেখকেরা ছিলেন পুরোপুরি নাগরিক মানুষ—একমাত্র নগরজীবনের সুখদুঃখ ভাল-মন্দের সঙ্গেই তাঁদের একাত্মবুদ্ধি ছিল—পল্লীসমাজ বা পল্লী-জীবনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এও আমরা এই একই ধারার অনুবৃত্তি দেখতে পাই। সেই একই ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, শ্লেষাত্মক ভাষা, বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ও নীতি-প্রচার-প্রচেষ্টা—নাগরিক মনের সৃষ্টি নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্য। সৃষ্টিধর্মী কল্পনার গভীরতা বা ব্যাপকতা কিছুই তখনও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে চিহ্নিত করবার অবকাশ পায় নি।

সেই অবকাশ সৃষ্টি করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর হাতে পড়ে বাংলা উপন্যাসের পুষ্করিণী হঠাৎ ঘাট-ঘাটলার বাঁধন ভেঙে খরধারা স্রোতস্বতীর রূপ ধরে শিল্পকল্পনার উদার সমুদ্রের দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পল্লীজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-শূন্য হয়ে পড়েন নি, পুরো শহুরে মানুষ তিনি কখনও হতে পারেন নি। কাজেই শিল্পী হিসাবে শহরের গণ্ডি ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় নি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ধারাকে যে-লোকে পেঁৗছে দিলেন তার সঙ্গে পল্লীজীবনের বা পল্লীসমাজের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর উদ্দিষ্ট লোক ছিল আদর্শবাদের স্বর্লোক অথবা রোমান্সের কল্পলোক অথবা পারিবারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতময় অন্তর্লোক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে নগর-জীবন ও পল্লী-জীবন দুইএরই উল্লেখ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

এই একই কথা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধেও বলা চলে। তাঁর পরিণত হাতের লেখা কোন উপন্যাসে, মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বসঙ্কুল অন্তর্জীবন ব্যতীত আর কোন জীবনকে তিনি কোন রকম স্বীকৃতি দেন নি। ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিমিত কোন প্রকার খণ্ডজীবনকে সাহিত্যের বস্তু হিসাবে মেনে নেওয়া বোধ হয় তাঁর পক্ষে অসম্ভবই ছিল।

সম্ভবত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'-ই প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনীর চারিদিকে লেখক সুস্পষ্ট-ভাবে একটা অনাগরিক সামাজিক পরিমণ্ডল ফুটিয়ে তুলেছেন—তাঁর অঙ্কিত নরনারীগুলিকে একটা বৃহত্তর পল্লীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রই হলেন প্রথম শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের বাংলা ঔপন্যাসিক যিনি—অল্প দুই-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া—স্বরচিত উপন্যাসে নগর-জীবনকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে গেছেন কিংবা বড় জোর তাকে প্রবাস-জীবনের

নামান্তর হিসাবে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্রই বাংলা উপন্যাস-তরুকে নগরোদ্যান থেকে তুলে নিয়ে পল্লীসমাজের উর্বর ক্ষেত্রে রোপণ করেন।—এদিক দিয়ে বিচার করলে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, সবাই তাঁরই উত্তরসাধক।

এই প্রাথমিক আলোচনাটুকুর প্রয়োজন ছিল। যে সব আধুনিক সমালোচক পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচিত হতে দেখলেই তাকে পশ্চাদপসরণ বা পলায়নী-মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে মহা শোরগোল শুরু করে দেন তাঁরা ভুলে যান যে নগর-জীবনই বাংলা উপন্যাসের আদি উৎসভূমি এবং তার পক্ষে নগর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পল্লীভূমিতে পদক্ষেপ পশ্চাদপসরণ নয়, প্রগতি—শিল্পকল্পনার প্রসার-সাধন। আর একথাও বোধ হয় তাঁরা ভুলে যান যে এই প্রসার-সাধন ঘটেছে খুব সাম্প্রতিক কালেই।

সুতরাং যদি কোন আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক নগর-জীবন পরিহার করে শিল্পবস্তু হিসাবে একমাত্র পল্লীজীবনকেই অবলম্বন করেন, তা হলে তাঁকে জীবনভীতি বা পশ্চাদপসরণের অপবাদ আদৌ দেওয়া চলে না, বরং বলা চলে যে তিনি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটা স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারারই অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু তবু আমি বলব, বর্তমান যুগে বাঙালী ঔপন্যাসিকের পক্ষে—বিশেষত যাঁরা তরুণ তাঁদের পক্ষে—পল্লীজীবনের প্রতি ঔদাসীন্য ও নগর-জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

এর কারণগুলি অতি সুস্পষ্ট।

উপন্যাসশিল্প একান্তভাবে জীবনাশ্রয়ী—অকপট জীবন-নিষ্ঠা ব্যতীত কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে শিল্পী হিসাবে সার্থকতা লাভ অসম্ভব। কাজেই যুগজীবনের ভারকেন্দ্র যেখানে এসে পড়ে, ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টিও সেখানে এসে পড়তে বাধ্য। 'আলালের ঘরের দুলাল'

যখন লেখা হয়েছিল তখন এই ভারকেন্দ্র পল্লী-অঞ্চল ছেড়ে নবজাগরণের চাঞ্চল্য-মুখর নগরজীবনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমান যুগেও আমরা অনুরূপ একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি।

শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে আমাদের শহর আজ ফুলে ফেঁপে অতিকায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিত্তাকাঙ্ক্ষার মরীচিকায় প্রলুব্ধ হয়ে প্রতিদিন দলে দলে মানুষ পল্লী ছেড়ে শহরে চলে আসছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু নরনারীর দলও একবার শহরের ফাঁদে পা দিয়ে আর তা থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নাগরিক জনতার জটিলতার চাপে পড়ে জীবনের সরল রেখা বহু-বঙ্কিম ও গ্রন্থি-সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। জীবনযুদ্ধ তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যুগজীবনের ভারকেন্দ্র আবার নগরাশ্রয়ী হয়ে পড়েছে।

এই যে দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সমাকীর্ণ জটিল নাগরিক জীবনাবর্ত—এ থেকে শিল্পবস্তু আহরণ করে উপন্যাস রচনার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক যুগের সাহিত্যিকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ উপন্যাসই নগর-জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হবে এবং তারই মধ্যে আমরা সার্থকতম শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাব—যুগের মন এই প্রত্যাশাই করে।

কিন্তু এ প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। নগর-জীবন নিয়ে বহু রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প রচিত হয়েছে—কিন্তু আধুনিক যুগের এমন একখানিও সার্থক উপন্যাসের নাম আমার মনে পড়ছে না যাতে নাগরিক জীবনের বিশিষ্ট রূপটি অন্তত আংশিক ভাবেও প্রতিফলিত হয়েছে। নাগরিক উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে অনেক তরুণ ঔপন্যাসিকও আজ অনাগরিক জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন।

এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল একটা মৌলিক শিল্প-দৈন্য।

নগর-জীবন নিয়ে আধুনিক যুগে যে সব উপন্যাস রচিত হচ্ছে তার

বিষয়বস্তুকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) মানবিক সম্পর্কের—বিশেষ করে নরনারীর যৌন সম্পর্কের—জটিলতা ও বিকার, (২) জীবিকার দ্বন্দ্বে পরাভূত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোচনীয় জীবন-কাহিনী, (৩) ব্যক্তিগত কাহিনী অবলম্বনে প্রচারিত রাজনৈতিক মতবাদ, (৪) অবাস্তব প্রেম-বিলাস-কাহিনী, এবং (৫) প্রাচীন কলিকাতার পরিবেশে রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী।

পাঁচ নম্বরের বিষয়বস্তুটি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, কারণ নগর-জীবন বলতে আমরা বর্তমান যুগজীবনকেই বুঝি। ফর্দের বাকি অংশগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা এখনও নগর-জীবনের বিশিষ্ট ও অখণ্ড রূপটির সন্ধান করে উঠতে পারেন নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ পল্লীজীবনের ক্ষেত্রে যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এঁরা তা পারেন নি। নাগরিক জীবনের আবর্ত ও সংঘাতের মধ্যে যে বেদনাবিক্ষুব্ধ আনন্দ ও উন্মাদনা আছে এঁদের রচনার মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যায় না। এঁরা নিজেদের জীবন-নিষ্ঠ বলে প্রচার করেন, কিন্তু একদেশদর্শীর জীবন-নিষ্ঠা নেহাতই একটা ভূয়া জিনিস।

কিন্তু এঁদের আসল দৈন্য হল কল্পনার দৈন্য। জীবনের ফোটোগ্রাফ তুলে এঁরা ভাবেন, জীবন-চিত্র আঁকলেন। বারবার এঁরা অংশকে সমগ্র বলে ভুল করেন। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কেন্দ্রীয় কাহিনীর সঙ্গে বৃহত্তর নগর-জীবনের জটিলতার বা গভীরতার বা তীব্রতার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষমতা এঁদের নেই।

তরুণতর ঔপন্যাসিকদের এই কল্পনা-দৈন্য যতদিন না ঘুচবে বাংলা সাহিত্যে নগর-জীবন নিয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা ততদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

॥ বাইশ ॥

বাংলা সাহিত্যের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং বোধ হয় সাহিত্যিকদের উৎসাহ বর্ধনের জন্যে প্রতি বৎসর কয়েকটি করে সরকারী এবং বেসরকারী পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারী পুরস্কারগুলির আর্থিক মূল্য এবং মর্যাদা-মূল্য দুইই অবশ্য বেশি, কিন্তু তাই বলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত পুরস্কার সম্বন্ধেও সাহিত্যিক মহলে ঔৎসুক্যের অথবা প্রত্যাশার কোন রকম অভাব আছে বলে মনে হয় না। এই সব পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে এবং কাকে দেওয়া হবে না তা নির্ধারণের জন্যে নাকি নানাবিধ সূক্ষ্ম 'তার-টানাটানি'-ও চলে থাকে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ বসুন্ধরা আজকাল সত্যই তদ্বিরভোগ্যা।

আমি বাইরের লোক, কাজেই এই বাৎসরিক সাহিত্য-পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল যেমন ব্যক্তিগত ভাবে আমার মর্মজ্বালা উৎপাদন করতে পারে না, তেমনি গোষ্ঠীগত ভাবে আমাকে বিজয়োল্লাসে উদ্দীপিত করে তুলতেও পারে না। বস্তুত আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মানুষ —সাহিত্যিক নই, সাহিত্য-সমালোচকও নই, সাহিত্য-পাঠক মাত্র। আমার বক্তব্য সর্বক্ষেত্রেই সাহিত্য-পাঠকের বক্তব্য। এই পুরস্কার দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটাকেও আমি সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি দিয়েই বিচার করতে চাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদক দুখানিকে এ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যায়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা পদক বিতরণ ব্যাপারে এমন একটা চমৎকার নির্দলীয় ও নিরুদ্বেগ convention সৃষ্টি করেছেন যার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে অশিষ্টাচরণ ও রুচিবিকারের দায়ে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা। তাঁরা চান কিছু সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এবং নিঃসন্দিগ্ধ বয়ঃপ্রবীণতা। প্রবীণ

সাহিত্যিকেরা পুরস্কৃত বা সম্মানিত হলে সাহিত্য-পাঠকেরা সকলেই খুশি হয়ে থাকেন।

অন্যান্য পুরস্কারগুলি সম্বন্ধেও যদি অনুরূপ ভাবে নিঃসংশয় হতে পারতাম তাহলে সব দুশ্চিন্তার অবসান হত। কিন্তু তা হবার নয়।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, পুরস্কারগুলির বিচারবস্তু কি?—গ্রন্থ, না গ্রন্থকার? সরকারী আইন নাকি এই যে গ্রন্থবিচারের ভিত্তিতেই পুরস্কার প্রদত্ত হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, (বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে) কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকার উভয়েই এ আইন একাধিক বার লঙ্ঘন করেছেন। সরকারী পুরস্কার-প্রাপ্ত এমন কয়েকখানি বইএর নাম আমার মনে পড়ছে কোনরূপ পুরস্কার অর্জনের যোগ্যতা যাদের নেই;—অথচ এই সব বইএর যাঁরা লেখক সাহিত্যিক হিসাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য; অনেক দিন আগেই তাঁদের রচিত শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থগুলি পুরস্কৃত হওয়া উচিত ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ সব ক্ষেত্রে গ্রন্থকে নয়, গ্রন্থকারকেই পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমাদের অবশ্য তাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই, কিন্তু আইনঘটিত অস্পষ্টতা অবিলম্বে দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। নইলে ভবিষ্যতে নানারকম সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে—মামলা-মোকর্দমা রুজু হওয়াও অসম্ভব নয়।

বেসরকারী পুরস্কারগুলি কি অবলম্বন করে কিসের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়ে থাকে তা আমরা এখনও সুস্পষ্ট ভাবে জেনে উঠতে পারি নি।

তবে একটা বিষয় সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ নেই। সরকারী বা বেসরকারী প্রত্যেকটি পুরস্কার-বিতরণ প্রতিষ্ঠানের পিছনে একটি করে পরামর্শদাতা-গোষ্ঠী অবশ্যই আছেন। এই মন্ত্রণা-সমিতিগুলি সম্বন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্য-পাঠক-সমাজে কৌতূহলের অন্ত নেই।

এঁরা কারা?—সাহিত্যিক? সাহিত্য-সমালোচক? সাহিত্যের অধ্যাপক? সাংবাদিক?

কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটা হল—এঁরা সাহিত্য-পাঠক কি না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের উৎসাহ আছে কি? বাংলা সাহিত্যের

প্রতি এঁদের সত্যকার অনুরাগ আছে কি? এঁদের সাহিত্যপ্রীতি গোষ্ঠীপ্রীতির নামান্তর নয় তো? বাংলা সাহিত্যকে উপলক্ষ করে আশ্রিতপোষণের দাক্ষিণ্য এবং দলগঠনের নৈপুণ্য প্রদর্শনই এঁদের উদ্দেশ্য নয় তো?

পাঠক-সমাজে এ ধরনের সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে, এবং অনেকে মনে করেন যুক্তিযুক্ত কারণেই হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান পুরস্কার বিতরণ করেন তাঁরা যদি নিজেদের এই জাতীয় সন্দেহের নাগালের বাইরে রাখতে না পারেন তা হলে তাঁদের সমস্ত সদুদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমার পাঁঠা আমি ল্যাজে কাটব; আমার পুরস্কার আমি যাকে খুশি দেব—আশা করা যায়, এ রকম মনোভাব তাঁদের কারও মধ্যে নেই (এবং যদিও বা থাকে, সেটা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা তাঁরা কেউই চান না)। তাঁদের প্রদত্ত পুরস্কার সৎসাহিত্যের স্রষ্টাদের উৎসাহিত করবে, সাহিত্যিক মহলে সৎসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করবে—ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই তাঁদের সত্যকার উদ্দেশ্য।

তা যদি হয় তা হলে তাঁদের দুটি কাজ করতে হবে।

প্রথম কাজটি অত্যন্ত সহজসাধ্য। প্রতি বৎসর প্রত্যেকটি পুরস্কারের জন্যে যে বিচারকমণ্ডলী নিযুক্ত হবে তার সদস্যদের নাম প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করতে হবে। সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত বিচারকমণ্ডলীর চরম রায়ও অনুরূপ ভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন। তা হলে আর কোন তরফেরই দায়িত্বহীনতার অপবাদে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নির্বাচন পাঠক-সাধারণের মনোমত না হলেও 'অমুক অমুক বিখ্যাত ব্যক্তির এই মত'—একথা ভেবে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে।

দ্বিতীয় কাজটি ঈষৎ ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এটি যতদিন না করা হবে ততদিন এই জাতীয় বিচারকার্যের সততা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুতেই ঘুচবে বলে আমার মনে হয় না।

বিচারকমণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যকে এই বিচারকার্যের জন্যে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে। যদি কেউ পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করেন তা হলে ঘোষণায় ও বিজ্ঞাপন-পত্রাদিতে তাঁর নামের পাশে 'অবৈতনিক'—এই কথাটি লিখে দিতে হবে। কেবলমাত্র অবৈতনিক সদস্যদের দ্বারা কোন বিচারকমণ্ডলী গঠিত হতে পারবে না। এবং বিচারকার্য সম্পন্ন হবার পর প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে লিখিত রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম অবৈতনিক কর্মীদের দ্বারা সুসম্পন্ন হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। দুই-একজনের নাম অবশ্য মনে পড়ছে যাঁরা বিনা দক্ষিণায় প্রয়োজনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সবাই এখন স্বর্গত, এবং তাঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে অ্যামেচার। বাংলা সাহিত্যের বাজারে এখন যে যুগ চলছে সেটা অ্যামেচারের যুগ নয়, পেশাদারের যুগ। পেশাদারের কাছ থেকে সময় ও চিন্তা দাবি করতে হলে তার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

সাহিত্য-বিচারের ব্যাপারে এখন যাঁরা সাধারণের আস্থাভাজন হতে পারেন তাঁদের যেভাবে অর্থোপার্জনের ধান্দায় চর্কির মত সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে দেখি তাতে মনে হয় কোন প্রকার লাভের আশা ব্যতিরেকে ব্যয় করবার মত সময় তাঁদের হাতে এক মিনিটও আছে কি না সন্দেহ। এঁদের দিয়ে অবৈতনিক কাজ—তাও আবার যে-সে কাজ নয়, বিশ-পঁচিশ খানা মোটা মোটা কেতাব পাঠ এবং তাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার—করিয়ে নিতে গেলে ফল আদৌ ভাল হবার সম্ভাবনা নেই।

এঁদের মত লোকেরা যখন এই রকম দায়িত্বপূর্ণ অবৈতনিক কাজের ভার কাঁধে তুলে নিতে স্বীকৃত হন তখন বুঝতে হবে—

কাজটা তাঁরা করবেন না—একখানা বইও ভাল করে পড়বেন না, শুধু পরের মুখে ঝাল খেয়ে যা-তা একটা গোঁজামিল দিয়ে দায়

থেকে উদ্ধার পাবেন ; তা ছাড়া এই সুযোগে যতটা পারেন আশ্রিত-পোষণ, ব্যক্তিগত হিংসা ও ক্রোধের চরিতার্থতা সাধন, কর্তাব্যক্তির মনোরঞ্জন ও নিজস্ব গোষ্ঠীর আনুকূল্য সাধন করে নেবার চেষ্টা করবেন ; অধিকন্তু এই অবৈতনিক সেবাটুকুর পরিবর্তে পুরস্কারদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও বড় রকমের কোন 'কাজ গুছিয়ে নেবার' ফন্দি আঁটতে থাকবেন।

অ্যামেচার মনোভাবাপন্ন দুই-একজন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। এ আলোচনা তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে এ আলোচনার যাথার্থ্য তাঁরাও অস্বীকার করবেন বলে মনে হয় না।

জানি, সরকারী বা বেসরকারী কোন পুরস্কারদাতা প্রতিষ্ঠানই আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে রাজি হবেন না—তাঁদের নাকি 'নানা রকম অসুবিধা' আছে। এই অসুবিধাগুলো কি তা জানবার সুযোগ আমার বা অন্যান্য সাহিত্য-পাঠকদের কোন দিনই হবে না, সুতরাং তাদের নিরসনের উপায় কিছু আছে কি নেই তাও আমরা কোনদিনই বুঝতে পারব না।

আরও একটা কথা। যে সব সাহিত্যিক এর মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন—এই সব পুরস্কারের উদ্দেশ্য কি একমাত্র তাঁদেরই সম্মানিত ও উৎসাহিত করা ? সে কাজটা শুধু সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দিলেই কি ভাল হয় না ?—আমার তো মনে হয়, বেসরকারী পুরস্কারদাতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অনাবিষ্কৃত প্রতিভার আবিষ্কার। তা যদি তাঁরা না পারেন, শুধু যদি অন্ধ ভাবে সরকারী পন্থারই অনুসরণ করতে থাকেন তাহলে তাঁদের প্রদত্ত পুরস্কারগুলো চিরকাল consolation prize মাত্রই হয়ে থাকবে, নিজস্ব মর্যাদা কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

॥ তেইশ ॥

Tour de force কথাটির আভিধানিক অর্থ সবাই জানেন—বিশেষ শক্তির বা নৈপুণ্যের পরিচায়ক কর্ম। কোন শিল্পী যখন নিজের অভ্যস্ত বা স্বভাবসিদ্ধ শিল্পপন্থা ছেড়ে নূতন ধরনের কোন শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেন তখন সেই বস্তুটিকেও সাধারণত এই নামে অভিহিত করা হয়। মাইকেল এঞ্জেলো ভাস্কর ছিলেন, তিনি ছবি এঁকেছিলেন; চিত্রকর রাফাইল কবিতা লিখেছিলেন; সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতি ব্যস্ত নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রও নাট্যরচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলি সনেট রচনা করেছিলেন। ইব্‌সেন 'পীয়ার জিণ্ট্‌' লিখেছিলেন, ডিকেন্‌স্‌ লিখেছিলেন 'এ টেল অব্‌ টু সিটিজ্‌', কীট্‌স্‌ 'হাইপিরিয়ন' লিখতে শুরু করেছিলেন। এ সবই tour de force. বাংলা সাহিত্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাইকেলের দুখানি প্রহসন ও রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র-কথা। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে tour de force জাতীয় গ্রন্থ রচনা বিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে সাহিত্যিক আবহাওয়ার staleness দূরীভূত হয়, সাহিত্যিকের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, সাহিত্য-পাঠক বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়, এবং সাহিত্য-প্রকাশক বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলাবার সুযোগ পায়।

* * * *

তরুণ বয়সের লেখকেরা লিখতে চান এবং পাঠকেরা পড়তে চান শুধু ট্রাজেডি। প্রবীণ বয়সে রুচি পালটে যায়, তখন ট্রাজেডি লিখতে বা পড়তে আদপেই ভাল লাগে না। যাঁদের পথে ঘাটে অনবরত হো-হো করে হেসে বেড়াতে দেখা যায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরাই চান 'অঝোর-ঝরন অশ্রুধার'। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের মন সন্ধান করে বেড়ায় শুধু হাসির ও আনন্দের। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্য—সাহিত্য-স্রষ্টাদের পক্ষে বিশেষ করে সত্য। 'কিং লীয়ার'-এর মত সর্বনাশা

সর্বগ্রাসী ট্রাজেডি রচনার পরও যে কেউ 'সিম্বেলিন' বা 'টেম্পেস্ট'-এর সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে ফিরে আসতে পারে, চোখের ওপর প্রমাণ না থাকলে কি তা কারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হত? পক্ষান্তরে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে 'মোহমুদ্গার'-এর রচয়িতা মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বস্তুত সমস্ত ব্যপারটার মূলে আছে একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। তারুণ্য চোখ মেলে চেয়ে দেখে, তার সামনে আয়ুর অন্তহীন রাজপথ, আর চারিপাশে শুধু অবিচার ও অত্যাচার—ক্ষয়, ক্ষতি, লোভ ও বঞ্চনা। সে মনে করে, তাকেই এই সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে; কাজেই এই ক্ষয়, ক্ষতি, লোভ ও বঞ্চনার ইতিহাসই তার কাছে জীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সত্যবস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু তারুণ্য ও যৌবনের অবসানে মানুষ দেখতে পায়, তার পায়ের তলা থেকে আয়ুর মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে; এই সুন্দরী পৃথিবী, এই সুন্দর জীবন—দুদিন পরেই সব তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে! প্রবীণ ব্যক্তি যা দেখে তাই তার ভাল লাগে—আর এই ভাল লাগার ইতিহাসই জীবন সম্বন্ধে তার শেষ কথা হয়ে থাকে।—সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি যার নিজের জীবনে দেখা দিয়েছে, শিল্পসাহিত্যে কান্না খুঁজে বেড়ানো কি তার পক্ষে সম্ভব?—এই হল আমার থিসিস্। কিন্তু হায়, এ থিসিস্ আমার বানচাল করে দিতে বসেছেন একজন সর্বজনপরিচিত শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কথাসাহিত্যিক, যিনি সারা জীবন কৌতুক ও প্রসন্নতার চর্চা করে এসে পরিণত বয়সে আজ সূক্ষ্ম ট্র্যাজিক সুরের জাল বুনতে শুরু করে দিয়েছেন!

* * *

বাংলা দেশের তরুণতর সাহিত্যিকদের মত গোমড়া-মুখো গুরু-গম্ভীর জীব ভূভারতের আর কোথাও নেই। এঁরা হাসতেও পারেন না, হাসাতেও পারেন না—বস্তুত হাসি জিনিসটাকে এঁরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন, ছ্যাব্‌লামির নামান্তর বলে মনে করেন। আমরা যতটুকু জানি, তাতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্তত তাঁদের এ ধারণা

ভুল বলেই মনে হয়। সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, গম্ভীরস্বভাব ও ভারিক্কী চালের মানুষ হয়ে থাকেন। সাহিত্যিকের ধীশক্তির সঙ্গে সাহিত্যে হাস্যরসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাঁরা হাস্যরসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরাও এ কথাটা মেনে নিয়েছেন। হাল আমলের সাহিত্যিকেরা শুনেছি মননের বেজায় ভক্ত। এই 'মনন' বস্তুটি কি বলুন তো? যা সর্বক্ষেত্রে সযত্নে হাসির ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে চায় আমি তো অন্তত তাকে মূর্খতার নামান্তর বলেই ভেবে থাকি।—সুকুমার রায়ের আঁকা রামগরুড়ের ছানাটিকে কি খুব 'মননশীল' বলে মনে হয়?

*   *   *   *   *

বাংলাদেশে আজকাল এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, জনপ্রিয়তার বিচারে যার স্থান সাধারণত উপন্যাসের ঠিক নীচেই—বিশেষ বিশেষ পুস্তকের ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয়তা অনেক সময় উপন্যাসের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই জাতীয় সাহিত্যকে 'ভ্রমণোপন্যাস' বলা চলে। ভ্রমণকাহিনীর সত্য তথ্যের সঙ্গে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাবলী মিশিয়ে এই বইগুলিকে গড়ে তোলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রমণই মুখ্য, কল্পনার কাজ শুধু তাতে একটু অতিরিক্ত রঙ্, রস ও গতিবেগের সঞ্চার করা; অন্যান্য ক্ষেত্রে উপন্যাসই বড় হয়ে উঠেছে, ভ্রমণকাহিনী তার পৃষ্ঠপট জুগিয়েছে মাত্র। লক্ষ্য করেছি অনেক সুপণ্ডিত সমালোচক ও বিদগ্ধ পাঠক এই জাতীয় পুস্তক দেখলে একটু নাক সেঁটকান: ভ্রমণ ও উপন্যাসের মিলনকে তাঁরা হয়তো নিষিদ্ধ বা অবৈধ মিলন বলেই মনে করেন। আমি কিন্তু তাঁদের এই বিরাগের কোন হেতু খুঁজে পাই না। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনকাহিনীর অথবা আত্মজীবনীর সংমিশ্রণ অনেক দিন ধরে সর্বদেশেই প্রচলিত রয়েছে—কেউ কোনদিন আপত্তি করে নি। আবার আমার ব্যক্তিগত প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও উপন্যাসের সঙ্গে রাজনীতির

সংমিশ্রণও আজকাল বেশ চালু হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসে পাই উপন্যাসের সঙ্গে ভূগোলের সংমিশ্রণ; ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা তো আপনারা সবাই জানেন। তবে শুধু ভ্রমণোপন্যাসের বেলায় এ আপত্তি কেন?—ব্যঞ্জন যদি স্বাদু হয়ে থাকে তবে নির্বিবাদে তাকে উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তার মশলা-সংমিশ্রণ বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয় সে বিচার শুধু অবান্তর নয়, বুদ্ধিহীনতার পরিচায়কও বটে।

* * * *

আমি ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বোধ্য রচনা পছন্দ করি না—আমার ধারণা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোঁড়া চিন্তা আর তোৎলা ভাষার সংমিশ্রণের ফলেই এই দুর্বোধ্যতার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা অক্ষমতারই নামান্তর। কিন্তু 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে' যা সত্য 'সর্বত্র' তা সত্য নাও হতে পারে। একথা স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি যে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ফলে ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের ফলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে এক ধরনের শিল্পসঙ্গত দুর্বোধ্যতা দেখা দিতে পারে—এবং এ দুর্বোধ্যতা শুধু সেই সব সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই মার্জনীয় যাঁরা ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, অনুষঙ্গ, রূপকল্প প্রভৃতির সাহায্যে বোধগম্যতার গণ্ডির বাইরেও প্রভূত পরিমাণে রসসৃষ্টি করতে পারেন। —অর্থাৎ কোন কোন অবস্থায় জল ঘোলা হলেও গভীর হতে পারে। কিন্তু আমার এ স্বীকৃতি শুধু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; সমালোচনা-সাহিত্যের বেলায় আমি কোন রকম আপস করতে রাজী নই। সমালোচনা-সাহিত্যকে সরল ও সহজ সাহিত্য হতেই হবে—নতুবা তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।—তবে হ্যাঁ, প্রলাপের ভাষ্য প্রলাপ হওয়াতে কোন বাধা নেই; বস্তুত তাই হওয়াই স্বাভাবিক। এই রকম জনৈক ভাষ্যকারের লেখা থেকে একটা বাক্য উদ্ধৃত করছি: 'সুতরাং সৎ ও চিৎ-এর তাত্ত্বিকতার প্রতিফলন পড়ে যে মনে, সেই মনের বায়ুবিসর্পী প্রকল্পই শিল্পের রঙ্ ও

রস নির্ধারণ করে।'—বহুদিন আগে একটা আধুনিক কাব্যপংক্তি পড়েছিলাম :

'অতএব জিল্‌হাম্বিলাম্বিতে।'

—সেই 'অতএব'-এর সঙ্গে এই 'সুতরাং'-কে মিলিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না। কালপুরুষের কুলায়ে দেখছি আধুনিকতর পরভৃতেরা নূতন নূতন ডিম পাড়তে শুরু করেছেন।

* * * *

কথাসাহিত্যের নিতান্ত নাবালক ছাত্রেরও জানা আছে যে ছোটগল্প ও উপন্যাস এক বস্তু নয়। কতকগুলো ছোটগল্পকে এক সূত্যোয় গেঁথে ফেললে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসারকেও ছোটগল্প বলা চলে না। ছোটগল্পের বস্তু, রস, আঙ্গিক—সবই স্বতন্ত্র। অনেকে ছোটগল্পকে লিরিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু এ তুলনা একেবারেই অচল। লিরিকজাতীয় কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ হল এই যে, কবি সেখানে নিরপেক্ষ নন। কবিমানস ও কাব্যকৃতির অভিন্নতার মধ্যেই লিরিক কাব্যের রসবৈশিষ্ট্য নিহিত। কিন্তু ছোটগল্পের গল্পকারের পক্ষে নির্লিপ্ততার পন্থা ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার পন্থাই বর্জনীয়। উপন্যাসের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বরং ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝে নিজের মনের দরজা খুলে দিতে পারেন, কিন্তু ছোটগল্পের বেলায় তা করতে গেলেই রসভঙ্গ হতে বাধ্য। ছোটগল্পের লেখক দ্রষ্টা মাত্র। এই কারণেই ছোটগল্পের রসে ও আঙ্গিকে irony-র এত বাহুল্য দেখা যায়। এক দিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে যে 'Life's little ironies'-ই সর্বশ্রেণীর ছোটগল্পের একমাত্র উপজীব্য বস্তু।

* * * *

ভাষার প্রসাদগুণ যে সত্য সত্যই একটা গুণ বহু আধুনিক লেখক তা ভুলতে বসেছেন। এঁদের অনেকে হয়তো ক্ষমতাশালী সাহিত্য-শিল্পী, কিন্তু সেই ক্ষমতার আস্ফালন যখন এঁদের ভাষারীতি ও বাগ্‌-ভঙ্গির মধ্যে উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন রসপিপাসু পাঠকের

পক্ষে তা দস্তুরমত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। ভাষা নিয়ে প্যাঁচ্ কষতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা ভাবেন, এই বোধ হয় তাঁদের বিদগ্ধজনোচিত মননশীলতার পরিচয় দেবার শ্রেষ্ঠ উপায়। আসলে কিন্তু এই ধরনের ভাষা রসের দিক দিয়ে তাঁদের দৈন্যেরই শুধু পরিচয় দেয়। কুস্তি-গিরকে কেউ নাচের আসরে ঠাঁই দেয় না। আবার এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁরা ভাষার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল নন। ঘোলা ভাষা, খোঁড়া ভাষা, তোৎলা ভাষা, ভব্যতাহীন অশিষ্ট ভাষা— যা তা একটা এঁদের হলেই হল। এঁদের ধারণা, সাহিত্যের রসবস্তুর সঙ্গে ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভাষাই সাহিত্যলক্ষ্মীর বাহন। দেব-দেবীর মর্যাদা অনেকাংশে তাঁদের বাহনের মর্যাদার ওপরেই নির্ভর করে। গর্দভারূঢ় শীতলা ঠাকরুণ কি মরালবাহিনী বীণাপাণির সঙ্গে সমান মর্যাদা দাবি করতে পারেন?

॥ চব্বিশ ॥

উত্তর-আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ঝড় উঠেছে। বজ্র-বিদ্যুতের দংষ্ট্রা বিস্তার করে সাম্রাজ্য-লোলুপতার অকাল-কালবৈশাখী দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভগবান বুদ্ধের ভারতবর্ষ, মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষ আজ বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছে, মরণপণ করে রুখে দাঁড়িয়েছে কপটাচারী জিঘাংসার কবল থেকে নিজের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে রক্ষা করবার জন্যে।

প্রাথমিক বিপর্যয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলা শুধু কাপুরুষতা নয়, চিন্তাহীনতারও লক্ষণ বটে। ইতিহাসের শিক্ষা ভুললে চলবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ইংরেজ হেরেছিল—ডানকার্কে হেরেছিল, সিঙ্গাপুরে হেরেছিল, বার্মায় হেরেছিল। রুশিয়ার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছিল ; লেনিনগ্রাড ও স্টালিনগ্রাড এখনও পুরাতন ক্ষতচিহ্ন বহন করছে।

ডেমোক্র্যাসির মন যুদ্ধচিন্তায় অনভ্যস্ত। যুদ্ধের জন্যে তার মন কোনদিনই প্রস্তুত থাকে না। হঠাৎ যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়লে এই অপ্রস্তুতির মূল্য তাকে দিতে হয়। কিন্তু সবশেষে যে হাসে তার হাসিই সার্থক হাসি। এই সবশেষের হাসি ডেমোক্র্যাসির হাসি। ভারতবর্ষের মুখে সে হাসি আবার একদিন ফুটবেই।

ভারতবর্ষ যুদ্ধবাজ এ অপবাদ তার অতি বড় শত্রুও আর তাকে দিতে পারবে না। প্রস্তুতিহীনতার চরম মূল্য দিয়ে তার শান্তিকামনার ঐকান্তিক অকপটতা সে আজ বিশ্বজনের সমক্ষে প্রমাণ করে দিয়েছে। যুদ্ধবাজ জাতিই যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয় : Those who live by the sword die by the sword.

সাময়িক ক্ষান্তি বা বিরতির ফলেও বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এ যুদ্ধ সহজে থামবে না, অনেক দিন ধরে চলবে। বস্তুত যুদ্ধ শুরু

হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চিন্তাধারা তাকে সহজভাবে যুদ্ধ বলে মেনে নিতে পারে নি। জাতির যাঁরা নেতা তাঁরা চোখ বুজে সত্যকে অস্বীকার করেছেন বারংবার—ভেবেছেন, তাঁরা অবিশ্রাম শান্তিমন্ত্র জপতে থাকলেই বুঝি জগতে সত্যসত্যই শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁরা নিজেরা নিষ্পাপ থাকলেই বুঝি জগতে আর পাপের অস্তিত্ব থাকবে না।

এ যুদ্ধ এখনও অনেক দিন চলবে। কারণ এ যুদ্ধ শুধু দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ নয়, দুটি বিপরীতধর্মী জীবনদর্শনের মধ্যে যুদ্ধ। শক্তির সংঘর্ষ এক পক্ষের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়; নীতিগত সংঘর্ষের সমাধান অত সহজে হয় না। জাতি, দেশ, কাল—সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে তার ব্যাপ্তি। চীন-ভারত যুদ্ধ যে ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক মহড়া নয় তাই বা কে বলতে পারে?

তাই বলছিলাম, এ যুদ্ধ সহজে মিটবে না—মিটতে পারে না।

রক্তপিপাসু বন্য দানব তার হিংসাবৃত্তির এক দফা পরিতৃপ্তি সাধন করে আবার তার পার্বত্য গুহায় ফিরে যেতে পারে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই; এবং এর ফলে যাঁরা সাময়িক ভাবেও উল্লসিত হতে পারেন তাঁদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয়।

অন্ধকার গুহার মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার সুযোগ হলে হয়তো আমরা দেখতে পাব, দানব বসে বসে তার সর্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন লেহন করছে পুনরায় নিজেকে সুস্থ করে তোলবার জন্যে—আবার নখরগুলি চেটে চেটে তাদের শাণিত জিঘাংসু করে তুলছে, যে নখরে এখনও লেগে রয়েছে আমার দেশের হাজার হাজার নির্ভীক নওজোয়ানের বুকের রক্ত।—সুযোগ পেলেই আবার সে বেরিয়ে আসবে নূতন রক্তের সন্ধানে।

সুতরাং আশ্বাসের কোন হেতু নেই।

এখন চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি। শত্রুকে শত্রু বলে চিনতে হবে, এবং এক আঘাতের পরিবর্তে তাকে দশ আঘাত ফিরিয়ে দেবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

পায়রা ওড়ানোর পালা শেষ হয়েছে; বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরকে পথে ফুল ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার ও মিত্রোত্তম বলে সম্বর্ধনা জানাবার মূঢ়তার অবসান হয়েছে; রাজনৈতিক আল্‌নাস্কারদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে।

আরাম, আলস্য, স্বার্থচিন্তা, ভেদবুদ্ধি ও সর্ববিধ ক্ষুদ্রতাকে আবর্জনার মত সমাজদেহ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার সময় হয়েছে।

'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'

দেশের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি আজ বদলে গেছে; সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলানো দরকার।

সর্বদেশের আধুনিক উল্ললাট সাহিত্যের গতিপথ একমুখী—বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রতার দিকে, অখণ্ড থেকে খণ্ডাংশের দিকে, সাধারণ থেকে অসাধারণের দিকে। কসমোপলিটান সাহিত্যের ধাপ্পাবাজিকে যদি হিসাব থেকে বাদ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাব, যা কিছু বহুজনকে এক করে, বহুজনের হিতসাধন করে, বহুজনের প্রচেষ্টাকে এক খাতে প্রবাহিত করায়—ধর্ম, আদর্শবাদ, জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম—সবই এই উল্ললাট সাহিত্যের বিচারে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বস্তু। এই অহং-কেন্দ্রিক সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য চিন্তানুবর্তন, আত্মবিশ্লেষণ, যৌনতাবিলাস, মনোবিকার ও স্নায়বিক ব্যাধি।

অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধি নামক একমাত্র ব্যাঙের আধুলির নানাবিধ রকমফের।

স্বার্থচিন্তার এই পদ্মব্যূহ ভেদ করে দেশের সাহিত্যকে আজ দেশের মাটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে—স্বদেশচিন্তার, স্বজাতিচিন্তার

উদার আলোকে অবগাহন করতে হবে। সেজন্যে যদি উল্ললাটত্বকে বিসর্জন দিতে হয়, তাও দিতে হবে।

আমি শুধু আমার নই, তুমি শুধু তোমার নও। আমার এবং তোমার চেয়ে বৃহত্তর এবং মহত্তর এমন কিছু আছে যার অংশীভূত হওয়াই আমার ও তোমার পক্ষে সবচেয়ে গৌরবের কথা।

আছে আমার দেশের মাটি, আছে আমার দেশের মানুষ,—আর আছে আমার সুপ্রাচীন ও সুমহান ঐতিহ্য, যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই আজ আমি ধর্মভ্রষ্ট, স্বদেশ ও স্বজাতির সঙ্গে একাত্মতা থেকে বঞ্চিত। সীমান্তের অশনিগর্জন ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই একাত্মবুদ্ধি ফিরে পাবার সাধনাই আজ আমাদের পক্ষে মহত্তম সাধনা। সাহিত্যকে আজ এই সাধনার বাণীই প্রচার করতে হবে।

বারবার দেখেছি, প্রগতিশীল বাঙালী কবি স্বদেশনিন্দার আবেগে আত্মহারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, প্রগতিশীল বাঙালী ঔপন্যাসিক ভয়াবহ পরধর্মের প্রশংসায় পাঁচশো পৃষ্ঠা ধরে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, প্রগতিশীল বাঙালী ছায়াচিত্র-প্রযোজক হাজার হাজার দর্শকের চোখের সামনে স্বদেশের ঐতিহ্যের মাথায় জুতো মেরেছেন। দেখেছি, আর শিউরে উঠেছি—আসন্ন মহতী বিনষ্টির দুঃস্বপ্ন দেখে মনে মনে দুর্গানাম জপ করেছি। সে দুঃস্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন মাত্র নয়; সর্বনাশা বিপর্যয়ের বাস্তব মূর্তিতে দেখা দিয়েছে উত্তর সীমান্তের অরণ্যে পর্বতে—রন্ধ্রগত শনির মত দেখা দিয়েছে দেশের সর্বাঙ্গের ফাটলে ফাটলে, অন্ধকার গলিঘুঁজির মধ্যে।

কিন্তু এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এরই ফলে জাতির মোহনিদ্রা ভেঙেছে, গণমানসে জোয়ার জেগেছে। দেশের মানুষ বুঝতে শিখেছে, দেশের জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে হয়—এবং সেই অনেক কিছু ছাড়বার মধ্যেই নিহিত আছে পরম আনন্দ, চরম উন্মাদনা।

সাহিত্য যদি গণমানসের অভিব্যক্তি বা প্রতিফলন হয় তা হলে সাহিত্যেই বা এ জোয়ারের গর্জন কেন শোনা যাবে না ?

যে সব 'বুদ্ধিজীবী' সমালোচক বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে ফতোয়া জারি করে বেড়ান—এবং বেড়াচ্ছেন—যে যুদ্ধের মধ্যে মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না তাঁদের বুদ্ধির বহর সত্যই বিস্ময়কর। যুদ্ধকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে সাহিত্য রচনা করে গেছেন বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস, হোমর, ভার্জিল থেকে শুরু করে শেক্স্পীয়র, মিলটন, স্কট, বায়রন, বঙ্কিমচন্দ্র, টল্স্টয়, হুগো, ডুমা, হেমিংওয়ে পর্যন্ত জগতের অসংখ্য সাহিত্যিক। এঁদের সবাইকেই মহৎ সাহিত্যের হুদ্দা থেকে নির্বাসিত করতে হবে ? তা হলে অবশিষ্ট কি রইল ? কি নিয়ে বেঁচে থাকব ?

শান্তি অতি উত্তম বস্তু। কিন্তু অত্যুত্তম বস্তুরও আতিশয্য অনিষ্টকর। অখণ্ড অনন্ত শান্তি মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। যুদ্ধ আনে আধিভৌতিক মৃত্যু ; এই ধরনের শান্তি আনে আধ্যাত্মিক মৃত্যু। এর ফলে মানুষের দেহের ও মনের সমস্ত পেশী শ্লথ হয়ে পড়ে, মানুষের দৃষ্টির ও অনুভূতির গণ্ডি সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, মানুষ সর্বপ্রকার মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বার্থসর্বস্ব ও শিশ্নোদরপরায়ণ হয়ে ওঠে। মানুষ ছোট হয়ে যায়। কিন্তু তার চাইতেও সাংঘাতিক কথা, বড় জিনিসকে উপহাস করে, ব্যঙ্গ করে, নিন্দা করে মানুষ এক ধরনের শয়তানী আনন্দ উপভোগ করতে শেখে।

আমাদের দেশের সমাজে ও সাহিত্যে এর সব কটি লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের সংঘাতে এই বিশ্বাস্পপূর্ণ কাচঘর চুরমার হয়ে গেছে। আবার এসে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে পেরেছি, খোলা হাওয়ায় বুকভরা নিশ্বাস নিতে পারছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !

যুদ্ধের ফলে সাহিত্য-কল্পনার দিগন্ত বিস্তৃততর হয়ে উঠবে। অনেক নূতন নূতন বিষয়বস্তুকে, নূতন নূতন সমস্যা ও দ্বন্দ্বকে, নূতন

নূতন অনুভূতির তীব্রতা ও জটিলতাকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে নেবার সুযোগ জুটবে সাহিত্যিকদের। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁরা বুঝতে শিখবেন যে আদর্শ পুরাতন হলেই পরিবর্জনীয় হয় না। বহু পুরাতনকে এবার নূতন চোখে দেখবার অবকাশ তাঁরা পাবেন, এবং তাদের মধ্যে যে কত নবীন সম্ভাবনার ভাণ্ডার নিহিত আছে তা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করতে পারবেন।

সাহিত্যিকদের এবার বোঝবার সময় হয়েছে যে সাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে অবৈধ প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আত্মরতির চেয়ে আত্মোৎসর্গ অনেক বেশি মহত্তর, যৌনতাবোধের চেয়ে স্বাজাত্যবোধ অনেক বেশি মূল্যবান।

আধুনিকতার সঙ্কীর্ণ অলিন্দে ব্রাত্য হয়ে পড়ে থেকে লাভ কি? সর্বকালীন আভিজাত্যের প্রাসাদ-চূড়ায় আরোহণ করবার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা কি সমীচীন হবে?

॥ পঁচিশ ॥

চীনা আক্রমণের সংকটকাল ঘনিয়ে আসার পর থেকে সমগ্র জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধের যে জোয়ার জেগে উঠেছে, সাহিত্যের উপকূলেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। ব্যাপারটা খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ দেশাত্মবোধক শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে। অতি বড় উল্ললাট সাহিত্য-রসিকও আজ এই জাতীয় রচনা দেখলে বিস্মিত, সন্ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ বা জুগুপ্সিত হয়ে ওঠেন না।

এই 'নূতন' সাহিত্যান্দোলন আমাদের কাছে আর নূতন নেই—পুরাতন এবং গা-সওয়া বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আজ তার সাহিত্য-ঘটিত এবং দেশাত্মবোধ-ঘটিত সার্থকতা নিয়ে যদি একটু আলোচনার চেষ্টা করি তাহলে বোধ হয় সেটা খুব অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না।

এই 'প্রতিরোধ সাহিত্য' পর্যায়ে কবিতা ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে অপর্যাপ্ত, বেশ কিছু নাটকও লেখা হয়েছে। কিন্তু এ শ্রেণীর ছোট গল্প আমার নজরে পড়েছে অতি সামান্যই, উপন্যাস আদৌ পড়ে নি।

যা হয়েছে তার হিসাব মেলাব পরে, যা হয় নি আগে তার কথাই বলি।

সীমান্ত-যুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস লেখবার সময় যে এখনও হয় নি সেকথা স্বীকার্য। সমসাময়িক ঘটনা তার সাম্প্রতিকত্ব হারিয়ে স্মৃতি-চেতনার পশ্চাৎপটে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাস-শিল্পের বিষয়ীভূত হতে পারে না। সুতরাং উপন্যাসের জন্যে আরও অপেক্ষা করতে আমরা রাজী আছি।

কিন্তু যুদ্ধ, প্রতিরোধ, স্বদেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের উর্বর ক্ষেত্র

থেকে বহুসংখ্যক ছোটগল্পের উদ্ভব কেন হতে পারল না তা আমার বুদ্ধির অতীত। সুযোগ ছিল সৈনিকজীবনের দুঃখকষ্ট, আদর্শবাদ, শৌর্য, উন্মাদনা, আত্মাভিমান ও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে গল্প লেখবার ; সুযোগ ছিল সংগ্রামের জয়পরাজয়, কলাকৌশল, এবং বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উপাদানগুলিকে গল্পের বিষয়ীভূত করে নেবার ; সুযোগ ছিল দুরধিগম্য অরণ্য-পর্বত-তুষাররাজ্যের অপরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে, সামরিক ও অসামরিক মনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে, দেশপ্রীতির উদার আকাশ থেকে, দেশদ্রোহের অন্ধকার গুহা থেকে, গুপ্তচরবৃত্তির জটিল গোলকধাঁধা থেকে, সাধারণের সাধারণত্ব থেকে, অসাধারণের অসাধারণত্ব থেকে বহুবিচিত্র গল্পবস্তু আহরণ করবার— কিন্তু সে সুযোগ বাংলা গল্প-লিখিয়েরা গ্রহণ করেন নি।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় প্রতিটি ইউরোপীয় ভাষায় অসংখ্য ছোটগল্প লেখা হয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলি বিশ্বসাহিত্যের স্মরণীয় সৃষ্টি হিসাবে অমর হয়ে থাকবে। সামান্য ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধ অবলম্বনে একমাত্র ফরাসী ভাষায় শুধু মোপাসাঁ যতগুলি সার্থক গল্প রচনা করে গেছেন চীনা যুদ্ধ নিয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার অর্ধেক সংখ্যক গল্পও কেন লেখা গেল না—তা আমার কাছে চিরদিনই একটা হেঁয়ালি হয়ে থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের গাল্পিকদের কল্পনা-দৈন্যই কি এর জন্যে দায়ী ? না, তাঁদের এই বিস্ময়কর বন্ধ্যাত্ব বাঙালী সাহিত্য-পাঠকদের ছোটগল্পের প্রতি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য থেকেই পরোক্ষ ভাবে উদ্ভূত ?

এর পর অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। যুদ্ধসংক্রান্ত ও দেশাত্মবোধমূলক নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব ব্যাপক বা ঘনিষ্ঠ নয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দুই একখানি নাটিকা পড়েছি, রেডিওতে কয়েকখানির অভিনয় শুনেছি, একখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেখেছি। কিন্তু যা দেখেছি এবং যা শুনেছি তার ফলে খুব আশান্বিত হয়ে উঠতে পারি নি। অনেক

সময়েই মনে হয়েছে, অন্তরের তাগিদে নয়, বাইরের ফরমাইশে এ সব নাটক-নাটিকা রচিত হয়েছে। ফলে দেশপ্রেম শূন্যগর্ভ প্রচারে পর্যবসিত হয়েছে। নাট্যবস্তু আহরণ করা হয়েছে, জীবন থেকে নয়, খবরের কাগজের হেড্‌লাইন থেকে। সংলাপ শুনে মনে হয়েছে যেন পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনছি। সর্ববিধ নাট্যগুণবর্জিত এই জাতীয় নাটকের অভিনয়ে সাফল্য আনবার চেষ্টায় নটনটীরা যতই কলাকৌশল প্রদর্শন করুন না কেন তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই সব নাটকের রচয়িতারা ভুলে যান যে নাটককে আগে নাটক হতে হবে—একমাত্র সার্থক নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্যকারের পক্ষে তাঁর বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ভাল নাটক নিশ্চয় লেখা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখনও তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নি।

কবিতা অনেক লেখা হয়েছে এবং অনেক পড়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এত বোধ হয় না পড়লেই ভাল করতাম, এবং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এত লেখা না হলেই ভাল হত। কোন কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় এক বা একাধিক 'প্রতিরোধ কবিতা' ছাপা যেন একটা সম্পাদকীয় অবশ্য-কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। এর ফল সর্বক্ষেত্রে ভাল হয় নি—ভাল হতে পারে না।

বহু সংখ্যক কবিতা পড়তে বাধ্য হয়েছি যেগুলির মত নিষ্প্রাণ গতানুগতিক সাহিত্যবস্তু অন্য সময়ে খুব কমই নজরে পড়ে। হুজুগের মাতনকে ছন্দ-মিলের রোলিং মিল্‌-এ ফেলে সিন্থেটিক কবিতার চ্যাপ্টা পাত তৈরি করা হয়েছে, তারপর একটু বাগ্মিতার রঙীন প্রলেপ আর আলঙ্কারিকতার ফুলকারি দিয়ে সাজিয়ে ইঞ্চি মেপে টুকরো কেটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিন্তার গভীরতা নেই, অনুভূতির আন্তরিকতা নেই—কাব্যরূপ বা কাব্যরস সৃষ্টির বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। একটিমাত্র প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রকট—দেশপ্রেমের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে আত্মপ্রচারের প্রচেষ্টা। মরসুমের

বাজারে সব সময়ে সকলের সামনে আমার নামটা যেন চাউর থাকে—আমাকে যেন কেউ ভুলে যেতে না পারে! কাজেই, বাজাও রাম-শিঙা, বাজাও জগঝম্প—যত জোরে পার, যতক্ষণ ধরে পার! বীর্য না থাক্, আস্ফালন তো আছে! বক্তব্য না থাক্, বক্তৃতাবাজির শক্তি তো আছে!

তবে সুখের কথা এই যে দেশের কোন সাহিত্য-পাঠককেই আমি এ জাতীয় কাব্যের দ্বারা প্রতারিত হতে দেখি নি। এ সব কবিদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে কেউ বড় একটা ভুল করেন নি।

তারপর আছেন আধুনিক, আধুনিকতর ও আধুনিকতম কবির দল। এঁদের প্রেমের কাব্যও যেমন ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বস্তু, প্রতিরোধের কাব্যও ঠিক তাই। বস্তুত অনেক সময় এঁদের লেখা প্রেম-কাব্যের ও প্রতিরোধ-কাব্যের পার্থক্য বুঝতে আমাদের কালঘাম ছুটে যায়। এই ডাকিনী-কটাহের মালমশলার সঙ্গে আমরা সবাই অল্পাধিক পরিচিত, সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।

শুনেছি, 'তর তম'-দের প্রতিরোধকাব্যে নাকি খুব বেশী 'ঝাঁঝ' আছে। আমরা তাঁদের কবিতা বুঝতে পারি না—প্রধানতঃ ভাষাগত অসুবিধার জন্যে। চীনাদের বোধ হয় বুঝতে কোন কষ্ট হবে না।—এবং বুঝে তারা সবাই বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

শত্রুকে গালিগালাজ করে কবিতা লিখে আমাদের কি ইষ্টলাভ হবে, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে থেকে অকাব্য সৃষ্টির পথ প্রশস্ততর হবে, এই মাত্র। প্রতিরোধ-সাহিত্যের যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে, সে মূল্য সম্পূর্ণরূপে মন্ময়। আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত ও উদ্দীপ্ত করা, আমাদের অনুভূতিকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডি থেকে মুক্ত করে মহত্তর আদর্শের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া, আমাদের মানসিক প্রস্তুতিকে দৃঢ়তর করা—এই হবে সে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। চীনাদের থ্যাবড়া নাক, কুৎকুতে চোখ আর অং-বং কথা নিয়ে ছড়া বেঁধে খেউড়ের আসর বসালে সে উদ্দেশ্য সাধিত তো হবেই

না, লাভের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধ আরও একটু বাড়বে।

নাটকের বেলায় যে কথা একবার বলেছি, কবিতার বেলায় সে কথা আবার বলা প্রয়োজন এবং আরও জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। কাব্যকে প্রথমে সার্থক কাব্য হতে হবে—শিল্পবৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে, রম্যতাগুণের অধিকারী হতে হবে। নইলে শুধু প্রতিরোধের খাতিরে অকাব্যকে সুকাব্য বলে মনে করতে আমরা কিছুতেই রাজী নই।

সৌভাগ্যের কথা আমাদের দেশের অনেক প্রবীণ ও তরুণ কবি এ কথাটা বোঝেন। তাই এই হুজুগের ডামাডোলের মধ্যেও আমরা বহু সৎকাব্য ও মহৎ কাব্য সৃষ্টি হতে দেখছি এবং কবিতার এই নূতন দিগন্তবিস্তার দেখে আশান্বিত হয়ে উঠছি।

তারপর প্রবন্ধ-সাহিত্যের কথা। এ এক ব্রেজিলীয় মহারণ্য-বিশেষ! আকাশচুম্বী বনস্পতি আছে, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী আছে, ফুল আছে, পাখি আছে, প্রজাপতি আছে—আবার কাঁটাবন আছে, বিষফল আছে, গূঢ়ফণা গুপ্ত-সর্পও আছে।

বহু প্রবন্ধ পড়ে খুশি হয়েছি। সাংবাদিকতার নৈপুণ্য, তথ্য আহরণের ও পরিবেশনের মুন্সিয়ানা, ঐতিহাসিক পর্যালোচনার বিচক্ষণতা, তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মদৃষ্টি, দেশপ্রেমের অকপটতা—অনেক কিছু থেকেই নূতন আশা, নূতন জ্ঞান ও নূতন প্রেরণা লাভের সুযোগ পেয়েছি।

কিন্তু এমন প্রবন্ধও আমার কম নজরে পড়ে নি যা দেশাত্মবোধ ও শত্রু-প্রতিরোধের ভোল পুরোপুরি বজায় রেখেও নানাবিধ বিভ্রান্তি, হেত্বাভাস ও দুষ্টযুক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই সব প্রবন্ধকে আমি সরল মনে গ্রহণ করতে পারি নি—এগুলির রচয়িতাদের মনও খুব সরল বলে আমি বিশ্বাস করি না। নেড়া মাথা নিয়ে বারবার বেলতলায় যেতে আমি রাজী নই।

এই সব ভ্রান্তি ও কুযুক্তির কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) চীনা জনগণ নির্দোষ ও নিরীহ। তাদের কোন অপরাধ নেই। আমাদের ঝগড়া শুধু চীনা সরকারের সঙ্গে।

(২) কমিউনিজ্‌ম্‌ অতি উত্তম বস্তু। চীনারা আমাদের আক্রমণ করেছে, কারণ তারা সত্যকার কমিউনিজ্‌ম্‌ পরিত্যাগ করে হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছে।

(৩) চীনারা খুবই খারাপ, তবে আমরাও বিশেষ ভাল নই।

(৪) আমরা খুবই ভাল, কিন্তু চীনারাও নেহাৎ খারাপ নয়।

(৫) আমাদের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি খুব খারাপ বলেই আমরা চীনের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারি নি।

(৬) আমাদের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি খুব ভাল বলেই চীন আক্রমণ করেও পশ্চাদপসরণ করেছে।

(৭) চীন অতি দুর্বল রাষ্ট্র। তাকে আমরা সহজেই হারিয়ে দিতে পারব। কারও কাছ থেকে কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

(৮) চীন এত শক্তিশালী যে যুদ্ধ করে তাকে হারানো অসম্ভব, সুতরাং 'সম্মানজনক' আপসের পথই শ্রেষ্ঠ পথ।

(৯) যুদ্ধবাজ চীনের অনুকরণে আমাদেরও যুদ্ধবাজ হয়ে ওঠা অনুচিত।

(১০) দেশের খানিকটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিন্দুমাত্র ক্ষোয়া গেলেই সর্বনাশ !

(১১) দেশকে চীনের হাত থেকে বাঁচানোর চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন দেশকে 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের' হাত থেকে বাঁচানো।

—আর কত বলব ?

হায় দেশপ্রেম ! হায় প্রতিরোধ-সাহিত্য !

॥ ছাব্বিশ ॥

একজন নাম-করা কথাসাহিত্যিকের লেখা গুটিতিনেক ছোট গল্প এবং একটি বড় গল্প (অথবা উপন্যাস) পড়ে সম্প্রতি খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। রচনা কটিকে আমার নিজের বেশ উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি বলেই মনে হয়েছিল। ভাষার অনায়াস-নৈপুণ্য, জীবননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্রাঙ্কনের দৃঢ়তা ও পরিচ্ছন্নতা, চিন্তা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং তীব্রতা—সবই আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।

তারপর দ্বিতীয় অভিমতের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে আমার মেয়েকে বললাম লেখা কটা পড়ে ফেলতে। তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। সে যা বলল সংক্ষেপ করলে তা এই রকম দাঁড়ায়ঃ 'ভাল লেখা—খুব ভাল লেখা। বোধ হয় এ বছর পুজোর বাজারে এর চেয়ে ভাল লেখা আর কেউই লেখেন নি। কিন্তু ইনি কি কারও ভাল দেখতে পারেন না? যাদের কথাই লিখতে যান শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই সর্বনাশ না করতে পারলে কিছুতেই খুশি হতে পারেন না? এঁর কি ধারণা যে কোন মানুষই সুখী হতে পারে না? কারও সুখী হবার অধিকার নেই? ইনি বড় নিষ্ঠুর—আমার মনে হয় অকারণে নিষ্ঠুর; বোধ হয় ইনি নিষ্ঠুরতাতেই আনন্দ পান।'

চিন্তার মোড় অন্য দিকে ঘুরে গেল।

সাহিত্যে নিষ্ঠুরতার স্থান নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম।

জীবনে নিষ্ঠুরতার অভাব নেই। সত্য কথা বলতে কি, প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন সময় ভাবতে বাধ্য হয় যে জীবনের দেবতা নিষ্ঠুর দেবতা। তাঁর বুঝি শুধু ভেঙে ফেলাতেই আনন্দ। আশা ও আনন্দের রঙীন বুদ্বুদ একটুখানি ফেঁপে উঠতে না উঠতেই তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়াই বুঝি জীবনের স্বধর্ম।

জীবনে নিষ্ঠুরতা আছে, এবং সে নিষ্ঠুরতার পরিমাণ বা ভয়াবহতা কিছুই নেহাৎ কম নয়। সুতরাং সাহিত্যেও নিষ্ঠুরতা থাকতে বাধ্য, কারণ সাহিত্য জীবনসর্বস্ব বস্তু—জীবনে যা আছে তার কিছুই সাহিত্যের পক্ষে পরিহার করা সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত কথাটা খুবই সোজা। কিন্তু জটিল হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন আমাদের মনে পড়ে যে সাহিত্য শুধু জীবন নয়, জীবনের অতিরিক্ত আরও কিছু। সাহিত্য একটা শিল্প। জীবনের আইন আর শিল্পের আইন সর্ব ক্ষেত্রে এক নয়। শিল্পের নিজস্ব কতকগুলো বিধিবিধান আছে। সাহিত্য-শিল্পীকে সেগুলো মেনে চলতে হয়। জীবনের উপাদানগুলো একত্র জড়ো করতে পারলেই জীবননিষ্ঠ সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সেই সব উপাদানের শিল্পসঙ্গত ব্যবহারের দ্বারাই সাহিত্যিক তাঁর জীবননিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন।

নিষ্ঠুরতার বেলাতেও একথা সর্বদা মনে রাখা দরকার।

সম্প্রতি একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়লাম। লেখক নাম-করা ঔপন্যাসিক—আধুনিক উপন্যাস-রচনার টেক্‌নিক তিনি উত্তমরূপে অধিগত করেছেন। ফলে, তাঁর উপন্যাসে কাহিনীর অপ্রাচুর্য না থাকা সত্ত্বেও অতি-আধুনিক সাহিত্যসমালোচকেরা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন না। এর আগে তাঁর লেখা উপন্যাস কিছু কিছু পড়েছি—কয়েকখানি বেশ ভালও লেগেছে। লেখক এই উপন্যাস-খানির পরিচয় দিয়েছেন 'An entertainment' বা 'প্রমোদকাহিনী' বলে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, বইখানি তাঁর সাহিত্যজীবনের উপজাত বস্তু মাত্র—সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে বইখানির বিশেষ কোন মর্যাদা তিনি দাবি করেন না, পাঠকসাধারণের কিঞ্চিৎ প্রমোদবিধানই শুধু তাঁর কাম্য।—সুতরাং প্রমোদের সন্ধানে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

বইখানিতে একটি গুপ্তচরের জীবনের কয়েকটা দিনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার নিঃসঙ্গতার দুঃখ, তার অসহায়তার দুঃখ, তার জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ খুব ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে—প্রতিটি

অপ্রীতিকর, অস্বাচ্ছন্দ্যকর, পীড়াদায়ক খুঁটিনাটি অনুভূতি বিশদভাবে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তার পর প্রায় শত খানেক পৃষ্ঠা ধরে মারাত্মক মৃত্যুভয়ের মধ্যে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়েছে—তার মনে ও মগজে পক্ষাঘাত ধরানো হয়েছে, তাকে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপুত্তলীতে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। তার-পর দেখানো হয়েছে, কি ভাবে বেদম প্রহার খেয়ে তার হাত ভাঙল, দাঁত ভাঙল, সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরল, জিভ বেরিয়ে গেল, ইত্যাদি। তারপর পথের একটা নেড়িকুত্তার মত তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে।—কুৎসিত, কদর্য, উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতার একটা পঙ্কিল ঘূর্ণি সৃষ্টি করে লেখক আমাদের প্রমোদবিধানের চেষ্টা করেছেন (এবং সবচেয়ে আতঙ্কের কথা এই যে এই বস্তু থেকে প্রমোদ আহরণ করতে পারেন আধুনিক জগতে এমন সাহিত্য-পাঠকেরও হয়তো অভাব নেই)।

বইখানির সাহিত্যিক মূল্য সত্যই কিছু নেই। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে এ বইএর যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ এর মধ্যে আমরা একজন আধুনিক tough সাহিত্যিকের মনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত ভাবে দেখতে পাই। এই মন পুরোপুরি ধর্ষকামী মন—নিষ্ঠুরতা-বিলাসী মন। এ বিলাস রোম্যান্টিক কবির দুঃখ-বিলাস নয়, নৈরাশ্যবাদী দার্শনিকের বিষাদ-বিলাসও নয়—এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, আধুনিক মানসিকতার জঞ্জালস্তূপে গজানো ফণি-মনসার আগাছা-জঙ্গল। এর মধ্যে জীবন-নিষ্ঠার ছিটে-ফোঁটাও নেই, কারণ জীবননিষ্ঠার মূলে থাকে জীবনের প্রতি মমত্ববোধ। এ বস্তুর মধ্যে সে মমত্ববোধ আদৌ নেই, যা আছে তাকে বরং জীবন-বিদ্বেষই বলা চলে।

বাংলা কথাসাহিত্যে যদি কোনদিন এই জাতীয় নিষ্ঠুরতার উদ্ভব হয়—এবং তা হবার সম্ভাবনা পুরোপুরিই রয়েছে—তাহলে সেদিনকে আমি দুর্দিন বলেই মনে করব।

আর এক জাতীয় নিষ্ঠুরতা আজকাল সর্বদেশের সাহিত্যেই খুব প্রকট হয়ে উঠেছে, বাংলাদেশে তো দস্তুরমত একটা সাহিত্যিক

ফ্যাশানেই পরিণত হয়েছে।—মানুষ মরে যাচ্ছে; মানুষ অধঃপাতে যাচ্ছে; মানুষ পচে-গলে জঘন্য কৃমিকীটে পরিণত হচ্ছে; চারিদিকে শুধু অন্ধকার—আলো নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই; স্বর্গের সিংহাসন খালি পড়ে আছে, ভগবান মরে ভূত হয়ে গেছেন; পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব চলছে, পৃথিবী নরক হয়ে উঠেছে; পৃথিবীর সব মানুষই চোর, জোচ্চোর, খুনে, ডাকাত, ঘুষখোর আর কালোবাজারী; আমাদের এখন কর্তব্য শুধু চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা, শুধু গালাগালি আর অভিসম্পাত বর্ষণ করা। (এ সবের মধ্যে পরোক্ষভাবে একটা হিতোপদেশও প্রায় সব সময়েই উহ্য থাকে সেটা এই: অতএব এস আমরাও চোর, জোচ্চোর, খুনে হয়ে যাই, কৃমিকীটে পরিণত হই, শয়তানের সেবা করি— আর অবসর সময়ে মাঝে মাঝে একটু কাঁদি এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি।) এই মূলধন নিয়ে যাঁরা সাহিত্যের কারবারে নামেন তাঁরা নিজেদের বস্তুবাদী বা যথাবাদী বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তাঁরা দাবি করেন যে জীবন সম্বন্ধে তাঁরাই একমাত্র সত্যবাদী সাহিত্যিক।

এঁদের বিরুদ্ধে আমার দু দফা নালিশ আছে। প্রথমত এঁরা একদেশদর্শী। জীবনটা সত্যই এত নিরানন্দ, এত অন্ধকার বা এত ঘৃণার্হ বস্তু নয়। তার মধ্যে হাসি আছে, আলো আছে, আনন্দ আছে। নইলে তো এতদিন সব মানুষ হয় আত্মহত্যা করত নয়তো ধুত্তোর বলে লোটা-কৌপীন সম্বল করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যেত। আসল কথা, এই সব সাহিত্যিকেরাই ছ্যাক্ড়া গাড়ির ঘোড়ার মত চোখে ঠুলি লাগিয়ে বসে আছেন। জীবনের অন্ধকার আঁস্তাকুড়ের ছোট অংশটুকু ছাড়া আর কিছুই এঁদের নজরে পড়ে না। অংশ কখনও সত্য হতে পারে না—যাদের সমগ্র-দৃষ্টি নেই তাদের সত্যদৃষ্টিও নেই। বস্তুবাদী বা যথাবাদী যাই এঁরা হোন না কেন, সত্যবাদী এঁরা কিছুতেই নন।

দ্বিতীয় নালিশটা এই যে নিজেদের নির্বাচিত সাহিত্যক্ষেত্রেও এঁরা

শিল্পসৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন না—বোধ হয় তা করতে চানও না। তথাকথিত বস্তুবাদের ভূত এঁদের ঘাড়ে এমন শক্ত হয়ে চেপে বসেছে যে এঁদের হাতের আঁকা জীবনচিত্র রেখাচিত্র বা তৈলচিত্র কিছুই হয় না, হয় শুধু ফোটোগ্রাফ। ফোটোচিত্রের ব্যবসায়ীরা যাই বলুন না কেন, ফোটোগ্রাফিকে এখনও আমরা শিল্প বলে মানতে রাজী নই।

এঁদের নিষ্ঠুরতা ধর্ষকামী নিষ্ঠুরতা নয়, মর্ষকামী নিষ্ঠুরতা—আত্ম-নিপীড়নের স্পৃহা থেকেই তার উদ্ভব। এই সব সাহিত্যিকের মন অসুস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত। এঁদের রচিত সাহিত্যের ছোঁয়াচ তাই পাঠকের পক্ষেও অস্বাস্থ্যকর না হয়ে পারে না।

যে দুই জাতের সাহিত্যের কথা বললাম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখলে তাদের অন্তর্নিহিত মারাত্মক ত্রুটিটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ ত্রুটি পর্যবেক্ষণের ত্রুটি নয়, শিল্পায়নের ত্রুটি। এ সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা হয় গাছ গুনতে গুনতে বনের কথা ভুলে গেছেন, আর না হয়তো বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ক্রোধে ও আক্রোশে গাছে গাছে মাথা ঠুকে মরছেন। এঁদের মধ্যে কারও বা দৃষ্টিশক্তি আছে, কারও বা নেই—কিন্তু দর্শন-বুদ্ধি একজনেরও নেই। অথচ সাহিত্য-শিল্পীকে, জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক, দার্শনিক হতেই হবে।

জীবনে নিষ্ঠুরতা আছে। কাজেই সাহিত্যেও নিষ্ঠুরতা থাকতে বাধ্য। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পীর নিজের মনে নিষ্ঠুরতা থাকলে শিল্পী হিসাবে তাঁর অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

সত্যকার সাহিত্যিক কখনও নিষ্ঠুর হতে পারেন না। নিষ্ঠুরতার নিষ্ঠুরতম ছবি আঁকার সময়েও তাঁর মনে থাকবে শুধু সহানুভূতি এবং মমতা—এবং সর্বোপরি করুণা। এই করুণাই তাঁকে এনে দেবে বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ শিল্প-সাফল্য। সমস্ত সার্থক ট্রাজেডির মূলে আছে এই করুণা। (নিষ্ঠুরতা ট্রাজেডির অংশ হিসাবেই শুধু সাহিত্য-বস্তু বলে গণ্য হতে পারে। Entertainment বা প্রমোদ-বিধানের

জন্যে যাঁরা নিষ্ঠুরতার চর্চা করে থাকেন তাঁদের সাহিত্যিক না হয়ে অল্-ইন্ কুস্তিগির অথবা স্পেনদেশের ষাঁড়-লড়িয়ে হওয়া উচিত ছিল।)

ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যার আগে ওথেলো বলেছিলেন, 'But yet the pity of it, Iago : O Iago, the pity of it, Iago !'

ওয়েন তাঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর অসমাপ্ত ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'This book is about war and the pity of war. The poetry is in the pity.'

শেক্‌স্‌পীয়র ও ওয়েনের মনে এই pity বা করুণার ভাণ্ডার ছিল বলেই আমরা 'King Lear'-এর মত নিষ্ঠুর ট্রাজেডিও ফিরে ফিরে পড়ি, ওয়েনের রক্তাক্ত যুদ্ধকাব্যকে এত সমাদর করি। ('Titus Andronicus' নাটকখানি শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে শেক্‌স্‌পীয়র সাময়িক ভাবে এই করুণা-ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, এবং সেই জন্যেই এ নাটক আর কেউ পড়ে না। অনুরূপ কারণে হার্ডির 'Jude the Obscure' উপন্যাসখানি নানা গুণ সত্ত্বেও অবহেলিত ও অনাদৃত, যদিও তাঁর 'Tess' বা 'Return of the Native'-এর মত নিষ্ঠুরতম ট্রাজেডিগুলিও পাঠক-মনকে কখনও বিরূপ করে তোলে না।)

ঈশ্বরকে যাঁরা করুণাময় বলে বর্ণনা করে থাকেন, তাঁরা স্বপ্নেও একথা ভাবেন না যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা নেই। সৃষ্টি নিষ্ঠুর, কিন্তু স্রষ্টা নিষ্ঠুর নন। 'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—এ বিশ্বাস না থাকলে ভগবদ্বিশ্বাস অসম্ভব। শিল্পীও স্রষ্টা—এক হিসাবে তিনি ঈশ্বরের সমধর্মী, কেউ কেউ বলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তাঁকেও করুণাময় হতে হবে।

যে সাহিত্যশিল্পীর মনে করুণার অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে একমাত্র তাঁর সৃষ্টিতেই নিষ্ঠুরতা শিল্পসৌন্দর্য অর্জন করতে পারে—অন্যত্র তা শুধু অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ।

॥ সাতাশ ॥

বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি, মৃত্যু নাকি দুই প্রকারের হতে পারে—আধিভৌতিক মৃত্যু ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আধিভৌতিক মৃত্যুর মধ্যে কোন গ্লানি বা হীনতা নেই, কারণ তা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আধ্যাত্মিক মৃত্যু ত্রিবিধ—ক্লান্তিমৃত্যু, ত্রাসমৃত্যু ও ঈর্ষামৃত্যু। এর প্রথম দুটি অভাবজ—শক্তির অভাবে ক্লান্তিমতৃ্যু ঘটে, সাহসের অভাবে ঘটে ত্রাসমৃত্যু। কিন্তু ঈর্ষামৃত্যু স্বভাবজ ব্যাপার—মানুষের হৃদয়ের নীচতা ও ক্ষুদ্রতা থেকেই এর উদ্ভব। তাই ঈর্ষামৃত্যুকেই বলা হয় হীনতম, হেয়তম মৃত্যু।

সম্প্রতি কোন কোন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় সাহিত্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ঈর্ষামৃত্যুর নির্লজ্জ পৌনঃপুনিক নিদর্শন দেখতে পেয়ে বড়ই মনঃপীড়া অনুভব করেছি। কৌতূহলী অসাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

দলাদলি বাঙালী জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই আছে—সাহিত্যক্ষেত্রেও আছে। এই সাহিত্যিক দলাদলির ফল যে সব সময়েই খারাপ হয় তা নয়। মানসদ্বন্দ্বের আবহাওয়ায় শিল্পবুদ্ধিতে প্রখরতার শান পড়ে, শিল্পসৃষ্টির মুল্যায়নে সতর্ক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

কিন্তু দলাদলির ফল যদি এই হয় যে, বে-দলীয় সাফল্যের সংবাদ পাওয়া মাত্র নাম-করা সাহিত্যিকেরাও ক্রোধে ক্ষোভে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছাপার অক্ষরে কিষ্কিন্ধ্যাতাণ্ডব শুরু করে দেন, ক্রমাগত বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তারস্বরে আর্তনাদ করতে থাকেন, 'ওগো তোমরা সবাই চেয়ে দেখ গো, আমি যে বুক ফেটে মলাম গো!'—তা হলে সত্যই বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা সাহিত্যিকদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কারণ ঘটেছে বলতে হবে।

ঈর্ষামৃত্যুর ফলে ঈর্ষী ব্যক্তিরই মরণ ঘটে, আর কারও গায়ে

আঁচড়টিও লাগে না। তাই যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা ঈর্ষা গোপন করতে জানেন। ঈর্ষার সঙ্গে বোকামি সংযুক্ত হলে মানুষ যা করে থাকে ইংরেজিতে তাকে বলে making an exhibition of oneself. লোকে তখন দাঁত বার করে হাসে বটে—কিন্তু কাকে দেখে হাসে বলুন তো ?

॥ আঠাশ ॥

এতকাল পরে বোপদেব শর্মার বোধ হয় কলম-চালনা বন্ধ করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ব্যাপার যে রকম দাঁড়িয়েছে সেই রকমই যদি চলতে থাকে তা হলে আর দুদিন পরেই শেক্স্পীয়রের ওথেলোর মত শর্মাকেও 'occupation is gone' বলে কপালে করাঘাত করে কাঁদতে বসতে হবে।

কথাটা খুলেই বলি।

বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র-পত্রিকার অভাব মোটেই নেই। কিন্তু 'সাহিত্য-পত্রিকা' বলতে আমরা এতদিন যে বস্তু বুঝে এসেছি, গত দু-তিন বছর ধরে তার সংখ্যা, প্রচার, জনপ্রিয়তা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই ক্রমাগত কমে আসছে। কতকগুলি এর মধ্যেই উঠে গেছে কিংবা উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। যেগুলি এখনও টিকে আছে সেগুলি হয় উৎকট-রোগাক্রান্ত শীর্ণকায় মুমূর্ষু, আর না হয় চক্ষুকর্ণহীন জরাগ্রস্ত স্থবির। কাজেই 'পরিক্রমা'-রচয়িতার পক্ষে 'পরিস্থিতি' সত্যই 'ভয়াবহ'। আলোচনার যোগ্য 'সাময়িক সাহিত্য' যদি দুর্লভ হয়ে ওঠে তা হলে কি আলোচনা বন্ধ করাই যুক্তিযুক্ত নয় ?

আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো আপনার ঘরের সবচেয়ে কাছের পত্র-পত্রিকার স্টলটিতে গিয়ে সেটিকে একবার ভাল করে দেখে

আসুন—কিছুক্ষণ চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বেচা-কেনার গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আসুন।

দেখতে পাবেন, হয় স্টলটিতে আদৌ কোন সাহিত্য-পত্রিকা নেই, না হয় যা দু-একখানা পিছনের গাদায় পড়ে আছে তা কেউ কিনছে না—ভাল করে পাতা উল্‌টে দেখলে আপনিও তা কিনতে রাজী হবেন না।

অথচ জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকারও অভাব নেই। কিন্তু গরম কেকের মত হু-হু করে বিকিয়ে যায় যে পত্রিকাগুলো তার কোনখানাই বিশুদ্ধ সাহিত্য-পত্রিকা নয়। সাহিত্য-পত্রিকার বাজার নৈরাশ্য-জনকভাবে মন্দা।

সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা সিনেমা-পত্রিকা। এগুলিতে কি জাতীয় বিষয়বস্তু থাকে তা আপনাদের বা আমার কারও অজানা নেই, কারণ এদের বিরুদ্ধে বন্ধ করে রাখবার মত মজবুত দরজা বাংলা দেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। দেশের অনেক নামকরা রুচিবাগীশ 'কালচার-ভালচার'-দের বাড়িতেও এ জাতীয় পত্রিকা আমার নজরে পড়েছে।—এই সব সিনেমা-পত্রিকার কোন-কোনখানিতে আজকাল কিছু কিছু সাহিত্যবস্তুও পরিবেশন করা হয়—বোধ হয় ফাউ হিসাবে। শুনেছি, পত্রিকা-পরিচালকেরা এজন্যে সাহিত্যিকদের মোটা দক্ষিণা দিয়ে থাকেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ বদান্যতার প্রশংসা করতে আমরা বাধ্য। কারণ তাঁরা এই ফাউ-সাহিত্য তাঁদের পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত নাও করতে পারতেন—এবং না করলেও তাঁদের পত্রিকার জনপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র হানি হত না।

'বেতার জগৎ'-এর মত পত্রিকার জনপ্রিয়তা নিশ্চয় তার সাহিত্যিক উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে না।

দুখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু এদেরও নির্ভেজাল সাহিত্য-পত্রিকা বলা চলে না। 'অর্ধেক সাহিত্য এরা অর্ধেক সংবাদ,'—এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-পত্রের

সংমিশ্রণনৈপুণ্যের মধ্যেই বোধ হয় এদের জনপ্রিয়তার আসল কারণটি নিহিত আছে।

যাই হোক, বাংলাদেশে আজ যে সাহিত্য-পত্রিকার কোন জনপ্রিয়তা নেই একথা মর্মান্তিক ভাবে সত্য—এবং একথাও সত্য যে জনপ্রিয়তা দাবি করতে পারে এমন কোন সাহিত্য-পত্রিকাও আজকাল কোথাও নজরে পড়ে না।

কিন্তু কেন ?—কেন এমন হল ?

এ প্রশ্নের জবাব আমি এক এক তরফ থেকে এক এক রকম পেয়েছি।

সাহিত্য-পত্রিকার পরিচালকেরা বলেন, 'আমাদের কাগজ কেউ কিনতে চায় না মশাই,—এসব জিনিস আর বাজারে বিকোয় না। গাঁঠের কড়ি খরচ করে আর কাঁহাতক লোকসান দেওয়া যায় ? কাজেই—'

পাঠকেরা বলেন, 'আরে ছ্যা ছ্যা, যত সব আল্‌তু-ফাল্‌তু রাবিশ লেখা। একটা ভাল গল্প কি প্রবন্ধ কি কবিতা নেই কোথাও। গাঁঠের কড়ি খরচ করে অমন বাজে জিনিস কে কিনতে যাবে বলুন তো ? তার চেয়ে বরং—'

সম্পাদকেরা বলেন, 'ভাল লেখা পাই কোথা থেকে ?—লিখছে কে ? লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখে লিখে হা-ক্লান্ত হয়ে গেলাম মশাই,—তিন মাস ধরে দেব দেব করে শেষটায় অষ্টরম্ভা। পাতা ভরাই কি দিয়ে ? এমন জানলে কোন্—'

লেখকেরা বলেন, 'তুত্তোর সাহিত্য-পত্রিকার নিকুচি করেছে মশাই! অঘ্রান মাসে একটা গল্প ছাপা হল, আষাঢ় মাসে দক্ষিণান্ত হল—কুল্যে দশটি টাকা! লিখব কেন ওসব কাগজে ? কি খেয়ে লিখব ? তার চেয়ে ওরা—'

অর্থাৎ কাগজ বিক্রি না হলে ভাল লেখকদের লেখা কেনা যায় না; ভাল লেখকদের লেখা না ছাপতে পারলে কাগজ বিক্রি হয় না।

সেই পুরাতন দুষ্টচক্র। মাঝখান থেকে সম্পাদক আর পরিচালকের শুধু হা-হুতাশ করাই সার।

এখন এর প্রতিবিধান কি? কোন্ দাওয়াই খাওয়ালে মুমূর্ষু পত্রিকা পুনর্জীবন লাভ করবে? কোন্ কায়কল্পের ফলে স্থবির পত্রিকায় নূতন যৌবনের সঞ্চার হবে?

একটা বিধান অনেকেই দিয়ে থাকেন। সাহিত্য-পত্রিকা পরিচালনাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বড় বড় পুঁজিপতিদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে—'ক্যাপিটাল' চাই, 'অর্গানিজশন' চাই। দৃষ্টিভঙ্গিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে; প্রাচীন কর্মপন্থা পরিহার করতে হবে; মনে প্রাণে ভবিষ্যৎপন্থী হতে হবে।

কিন্তু যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন ব্যবসায়ীর হাতে যদি মোটা 'ক্যাপিটাল' থাকে এবং সুনিপুণ 'অর্গানিজেশন' থাকে, তা হলে সে চাইবে মুনাফা—যত সত্বর সম্ভব এবং যত উঁচু হারে সম্ভব। এবং যে বাজারে মুনাফা আছে সেইখানেই সে ব্যাব্‌সা ফাঁদতে চাইবে—অর্থাৎ বৃহত্তর সিনেমা-সাহিত্য পত্রিকা অথবা উৎকৃষ্টতর সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকা হাতে নিয়ে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সাহিত্য-পত্রিকার মত আধ-মরা বুড়ো ঘোড়া চাবকাতে চাইবে সে কোন্ দুঃখে? ব্যবসায়ীর কাছে সাহিত্য, সিনেমা, সংবাদ, সবই বিক্রেয় পণ্য মাত্র; বাজারে যে জিনিসের চাহিদা আছে তা ছেড়ে অবজ্ঞাত পণ্যের জন্যে চাহিদা সৃষ্টি করার দায়িত্ব সে কেন ঘাড়ে নিতে যাবে?

না—আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধানের জন্যে আমাদের চাইতে হবে, ভবিষ্যতের দিকে নয়, অতীতের দিকে। আমাদের কি করতে হবে বুঝতে হলে আমরা একদিন কি করেছিলাম সেই কথাটাই জানা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা অতীতে বরাবরই এক বা একাধিক সাহিত্য-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, এবং তার ফল বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বরাবরই কল্যাণপ্রসূ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন',

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' ও 'ভারতী', সমাজপতির 'সাহিত্য', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', দেশবন্ধুর 'নারায়ণ', জগদিন্দ্রনাথের 'মানসী ও মর্মবাণী', উপেন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা', দীনেশ দাসের 'কল্লোল', সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'—প্রত্যেকটি নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতি যতদিন বজায় থাকবে এ সব পত্রিকার নামও ততদিন তার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা হিসাবে এদের কোন্‌খানি কতটা সাফল্য লাভ করেছিল জানি না, কিন্তু প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এরা যে মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তা আধুনিক যুগের কোন সাহিত্য-পত্রিকা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

এইবার একটু ভেবে দেখা দরকার—কি ছিল এই সব পত্রিকার পিছনে, যা আজকালকার সাহিত্য-পত্রিকাগুলি হারিয়েছে এবং হারিয়ে দেউলে হতে বসেছে।

'বঙ্গদর্শন' থেকে 'শনিবারের চিঠি' পর্যন্ত যে ফর্দটি ওপরে দাখিল করেছি তার প্রত্যেকটি পত্রিকার উদ্ভব হয়েছিল প্রবল আদর্শবাদের প্রেরণা থেকে, এবং তাদের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মূলেও ছিল ঐ একই প্রেরণা—সৎসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা, স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল-সাধনের প্রেরণা। এই সব পত্রিকার পরিচালকেরা কেউ ব্যবসায়ী ছিলেন না, আধুনিক অর্থে পুঁজিপতিও ছিলেন না। পত্রিকা-পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা-শিকার তাঁরা কেউ করতে চান নি; বরং এই কর্মে লিপ্ত হবার ফলে কেউ কেউ বিলক্ষণ গাঁটগচ্ছাই দিয়ে গেছেন। তাঁদের লোকসানের ফলে লাভ হয়েছে দেশের ও দশের। —আধুনিক যুগে মুনাফাকেই লোকে শ্রদ্ধা করে—আদর্শবাদ উপহাস ও ব্যঙ্গের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক সাহিত্য-পত্রিকাগুলি এই 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'র জয়ধ্বজাই বহন করছে।

অতীতের সাহিত্য-পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা সকলেই ছিলেন

সাহিত্যিক—সাহিত্য-রসিক, সাহিত্য-প্রেমিক, সাহিত্য-পাগল। অনেকেই ছিলেন অবৈতনিক ; কেউ কেউ অবশ্য বেতন পেতেন, কিন্তু সে বেতনের অঙ্কের উল্লেখ করে আপনাদের হাস্যোদ্রেক করতে চাই না। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য পরিচালক ও সম্পাদক একই ব্যক্তি হতেন, কিন্তু অসাহিত্যিক ব্যবসায়ীর ভাগ্যে এ সম্মান কখনও ঘটত না—অর্থাৎ পরোক্ষে সেই আদর্শবাদের প্রেরণা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও কার্যকরী ছিল।

এই সব সম্পাদককে কেন্দ্র করে একটা করে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠত। এ থেকে দলাদলির সৃষ্টি যে না হত তা নয়—'নারায়ণ' ও 'কল্লোল'-কে কেন্দ্র করে যথেষ্ট দলাদলি হয়েছিল ; কিন্তু দলাদলি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। লেখকেরা নামমাত্র দক্ষিণা পেতেন। (এখন অবশ্য এদিক দিয়ে খরচ বাঁচানো সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়—কারণ সাহিত্য এখন আর নেশা মাত্র নেই, পুরোদস্তুর পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।) কিন্তু নিজ নিজ গোষ্ঠী-পত্রিকার প্রতি তাঁদের প্রীতি, মমত্ববোধ, আনুগত্য ও নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ।

আবার সেই আদর্শবাদের কথায় এসে পড়লাম।—পড়লামই যখন, তখন মোদ্দা কথাটা খোলসা করে বলে ফেলাই ভাল। আদর্শবাদকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে সাহিত্য-পত্রিকা চালানো অসম্ভব। আজকালকার সাহিত্য-পত্রিকাগুলো মরছে অথবা জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে, কারণ তাদের পিছনে কোন মহৎ আদর্শের প্রেরণা নেই।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলবার ছিল—আধুনিক যুগের সাহিত্য-পাঠকদের কথা, তাঁদের পরিবর্তিত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক।

পাঠকের চোখে বোপদেব শর্মা

[নীচের কবিতাটি ডাকযোগে হস্তগত হয়েছিল। 'জনৈক পাঠক—আসানসোল'—এ ছাড়া রচয়িতা নিজের নাম-ঠিকানার কোন হদিস দেন নি। ব্যক্তিগত কারণে কবিতাটি আমার ভাল লেগেছে। আরও হয়তো কারও কারও ভাল লাগতে পারে, এই আশায় ছেপে দিলাম।]

কাঁধে ঝুলি হাতে লাঠি ছেঁড়া চটি দুই পায়,
শহরের পথে পথে গুটি গুটি ও কে যায় ?
দুই চোখে ওৎ-পাতা বেড়ালের দৃষ্টি,
শিকার সে খুঁজে ফেরে বুঝি সারা সৃষ্টি ;
রোদে-জলে পুড়ছে, গলি গলি ঢুঁড়ছে,
অবিরাম খেটে খেটে বিগলিত-ঘর্মা !
—হায় হায় ঐ যায় বোপদেব শর্মা !

কলমের খোঁচাকাঠি বাগিয়ে সে ধরেছে,
সামনে এলেই কেউ অমনি সে মরেছে ;
ছুঁচো হোক, বিছে হোক, হোক না সে শার্দূল,
তেড়েফুঁড়ে টুঁটি টিপে বাধাবে হুলস্থূল।
নর্দামা শুঁকছে, পথে পড়ে ধুঁকছে,
দেখি নি জীবনে হেন নিরলস-কর্মা।
—হায় হায় ঐ যায় বোপদেব শর্মা !

ডাস্ট্‌বিন ঘেঁটে বলে,—'এতে ভারী গন্ধ !'
ঘেয়ো কুকুরেরে বলে,—'তুই বড় মন্দ !'
স্বভাবের দোষ তার কেউ নারে ঘোচাতে,
বন্ধু বিগ্‌ড়ে যায় কলমের খোঁচাতে ;

লোকে যায় গালি পেড়ে, ঝুঁটি ধরে দেয় নেড়ে ;
কিছুতেই হুঁশ নেই—গণ্ডার-চর্মা ।
—হায় হায় ঐ যায় বোপদেব শর্মা !

'ছাইত্য' ছাইগাদা দেখছে সে উড়িয়ে,
রতন মানিক কিছু পায় যদি কুড়িয়ে ।
টুটাফুটা হাঁড়িকুঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা কাচ—
হাতে কিছু ঠেকলেই ধেই ধেই সে কি নাচ !
অমনি বেরুবে লেখা,— 'ইউরেকা, ইউরেকা !
এল শুভদিন, শোন যত সমধর্মা !'
—হায় হায় ঐ যায় বোপদেব শর্মা !

হাটখোলা মাঝে গিয়ে আড় হয়ে পড়ছে,
বাণীর দেউল নাকি সেখানেই গড়ছে ;
মর্মের মর্মরে গড়া হবে ইমারত,—
চাই শুধু টন দুই হীরা-চুনি-মরকত ।
তাই ঘাম ঝরছে, ঘুরে ঘুরে মরছে :
মশলা মিলেছে কিছু—বাঁশ খড় দরমা ।
—হায় হায় ঐ যায় বোপদেব শর্মা !

আর কতদিন ক্ষ্যাপা হয়ে রবে হন্যে—
অমাবস্যার রাতে জ্যোৎস্নার জন্যে ?
এক গলা পাঁকে নেমে পঙ্কজ খুঁজবে ?
কেউ কোথা বোঝে না যা, সেই শুধু বুঝবে ?···
হয়েছে হাড়ির হাল, কবে ছেড়ে দিয়ে হাল
বলবে সে, 'এই বার তুই পার কর মা !'
—সেদিন খতম হবে বোপদেব শর্মা ॥